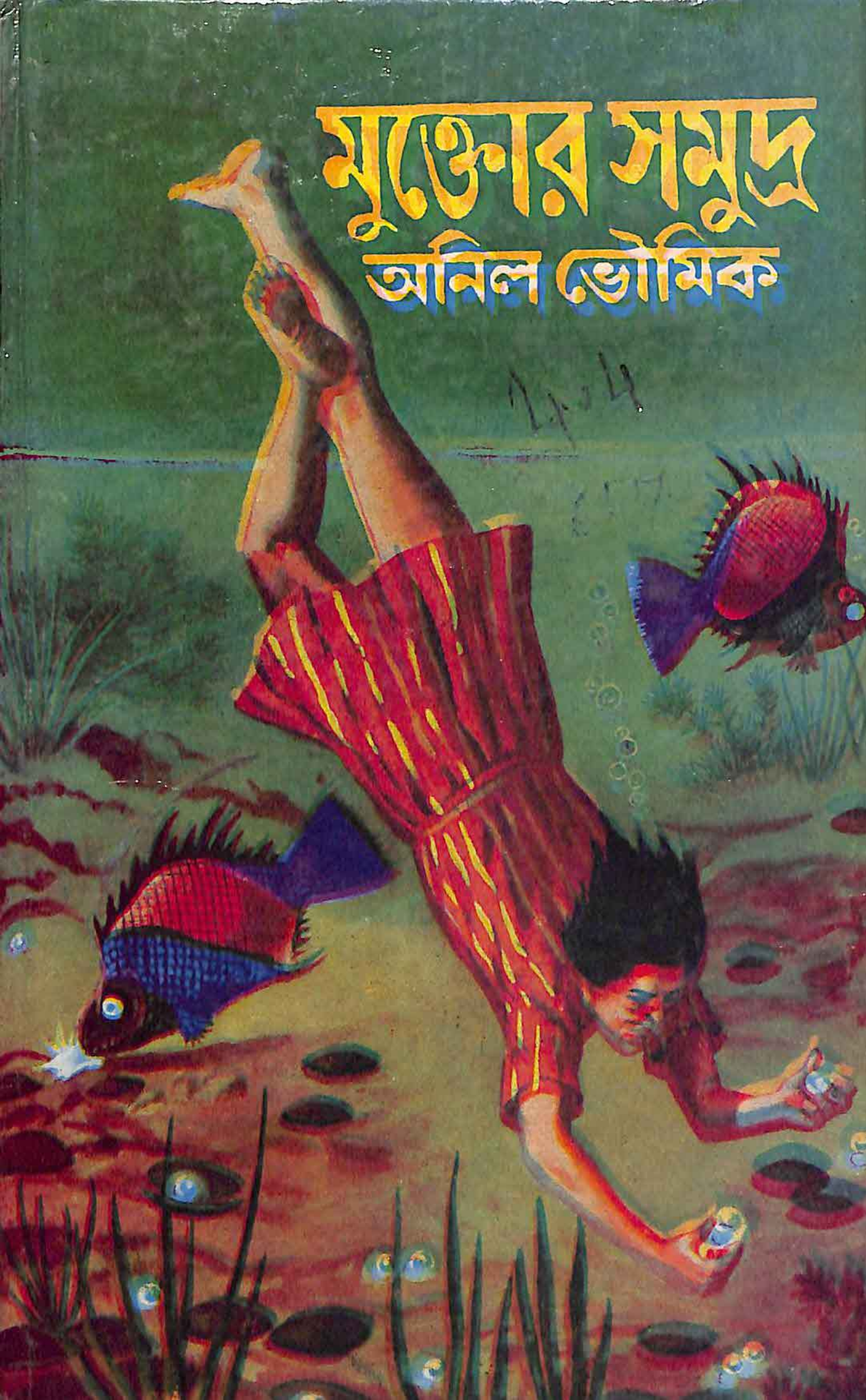
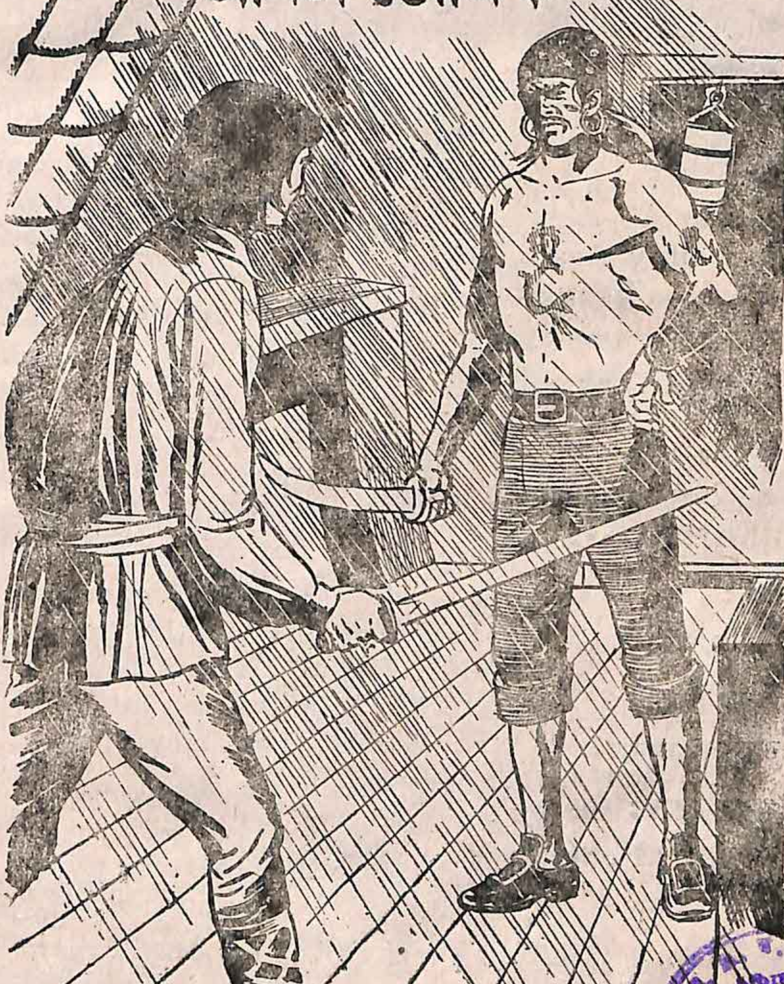

মুক্তোর সমুদ্র
অনিল ভৌমিক

মুক্তোর সমুদ্র

অনিল ভৌমিক



MUKTOR SAMUDRA
by Anil Bhowmik
Rs. 10·00

Published by—
UJJAL SAHITYA MANDIR
C-3, College Street Market.
Calcutta-700007 (1st floor)

প্রথম মুদ্রণ :
৩০শে, শ্রাবণ, ১৩৯৩
১৫ই আগস্ট, ১৯৮৬
দ্বিতীয় মুদ্রণ :
৩০শে শ্রাবণ, ১৩৯৫
১৫ই আগস্ট, ১৯৮৮

প্রতিষ্ঠাতা :
শরৎচন্দ্র পাল
কিরীটিকুমার পাল

প্রকাশিকা :
সুপ্রিয়া পাল
উজ্জ্বল-সাহিত্য-মন্দির
সি-৩ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট (দ্বিতলে)
কলিকাতা-৭০০০০৭

মুদ্রণে :
দিবাকর মুদ্রণ
৫৮, কৈলাস বোস স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৯

ব্লক :
বি, ডি, কনসার্ন

প্রচ্ছদ চিত্র :
নারায়ণ দেবনাথ

প্রচ্ছদ মুদ্রণে :
নিউ গয়া আর্ট প্রেস

দশ টাকা মাত্র

মুক্তোর সমুদ্র

ফ্রান্সিসদের জাহাজ পশ্চিম আফ্রিকা উপকূলের বন্দর ছেড়ে এসেছে অনেকক্ষণ। জাহাজ এখন মাঝসমুদ্রে। নির্মেঘ আকাশ। বাতাসে তেমন জোর নেই। সমুদ্র ও তাই শান্ত। জাহাজের ডেক-এর ওপর পায়চারী করছিল ফ্রান্সিস। ভাবছিল, আফ্রিকা থেকে হীরে নিয়ে আসার কষ্টকর অভিজ্ঞতার কথা। সেই সঙ্গে বারবার মনে পড়ছিল মোরান উপজাতিদের হাতে মকবুলের নির্মম মৃত্যুর কথা। বারবার চোখে জল আসছিল এই কথা ভেবে। মকবুলকে ও বাঁচাতে পারল না। নিজের জীবনের বিনিময়ে মকবুলই তাকে বাঁচবার পথ ক'রে দিলো। পায়চারী করতে-করতে ফ্রান্সিস এসে দাঁড়াল ডেক-এ রাখা গাড়ি দু'টোর কাছে। বিরাট হীরের খণ্ড দু'টো গাড়িতে রাখা। কাজকর্মের ফাঁকে-ফাঁকে জাহাজের সকলেই একবার ক'রে হীরে দু'টো দেখে যাচ্ছে। কী বিরাট হীরের টুকরো দু'টো! ওদের চোখে বিস্ময়ের শেষ নেই। ফ্রান্সিস হীরে দু'টোর কাছে দাঁড়াল। তখন সূর্য অস্ত যাচ্ছে। পশ্চিম আকাশে গভীর লাল সূর্যটা জলের ঢেউয়ের মাথায়। পশ্চিম দিগন্ত থেকে প্রায় মাঝ আকাশ পর্যন্ত লাল রঙের শব্দহীন ঢেউ। সেই আলো পড়েছে জাহাজেও। হীরে দু'টো লাল রঙের সেই রঙীন আলোয় স্বপ্নময় হয়ে উঠেছে। অনেকেই চারপাশে ভীড় করে সেই অপরূপ রঙের খেলা দেখছে। ঢেউ ছোঁয়া দিগন্তে আস্তে-আস্তে সূর্য অস্ত গেল। তারপরেও পশ্চিমাকাশে লাল আলোর ছাপ রইল অনেকক্ষণ। তারপর অন্ধকার নামতে হীরে দু'টোর গায়েও আলোর খেলা মিলিয়ে গেল।

ফ্রান্সিস ডেকের ধারে রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে রইলো। আকাশে ততক্ষণে তারা ফুটে উঠেছে। নিষ্প্রভ ভাঙা চাঁদটা উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল। একটা নরম জ্যোৎস্না ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে।

হ্যারি কাছে এসে ডাকল—'ফ্রান্সিস।'

ফ্রান্সিস ফিরে তাকিয়ে হ্যারিকে দেখে বলল—'হু।'

তারপর সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে রইলো!

'—এবার ঘরে ফেরা যাক্, তুমি কি বলো?' হ্যারি বলল।

'—হ্যাঁ'—ফ্রান্সিস একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

—'মনে হচ্ছে, তুমি এতেও খুব খুশী নও?' হ্যারি হেসে বললো।

ফ্রান্সিস মাথা নাড়ল। বললো 'সত্যিই আমি খুশী নই। কী হবে ফিরে গিয়ে? আবার তো সেই সুখ আর স্বাচ্ছন্দ্যের জীবন। উদ্দেশ্যহীন এক-ঘেঁয়ে জীবন, খাও-দাও-ঘুমাও।'

—আবার বেড়িয়ে পড়বে ভাবছো।

—দেখি—

—হ্যারি হাসল—'তুমি আর বেরোতে পারবে ব'লে মনে হয় না'।

—কেন?

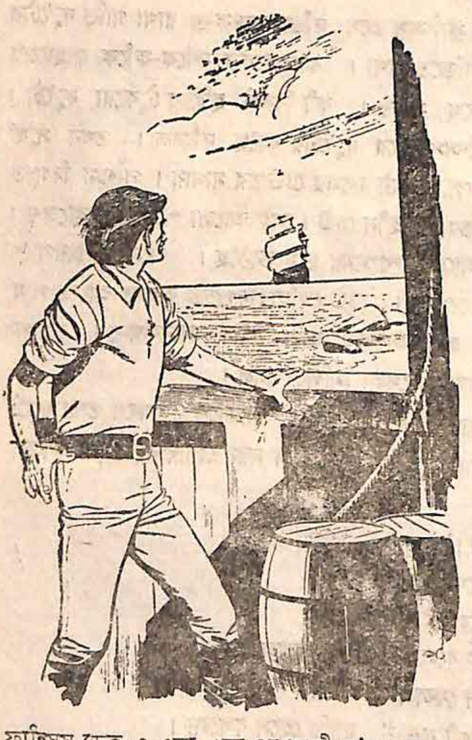
—রাজাকে এর আগে 'সোনার ঘন্টা' এনে দিয়েছো, এবার অতবড় দু'টো হীরে নিয়ে যাচ্ছো। এবার রাজামশাই তোমাকে নির্ঘাৎ সেনাপতি ক'রে দেবে।

ফ্রান্সিস হাসলো—'ওসব তালপাতার সেপাইগিরির মধ্যে নেই। ঠিক পালাবো আবার।'

দু'জনে আর কোন কথা বললো না। হ্যারি একটু পরেই চ'লে গেল। ফ্রান্সিস দূরে অন্ধকারে সমুদ্র আর তারা ভরা দিগন্তের দিকে তাকিয়ে নানা কথা ভাবতে লাগল।

* * *

দিন যায়। ওদের জাহাজ চলে শান্ত সমুদ্রের ওপর দিয়ে। ভাইকিংরা সকলেই আনন্দে আছে। কতদিন পরে আবার দেশে ফিরে চলেছে! যখন ডেক ধোয়া, রান্না করা, পাল ঠিক করা, দড়ি-দড়া বাঁধা, দাঁড়-বাওয়া এসব কাজ থাকে না, তখন জাহাজের ডেক-এর এখানে-ওখানে জড়ো হয়; ছোট-ছোট দল বেঁধে ছক্কা-পাঞ্জা খেলে, নয়তো গান নাচের আসর বসায়, নয়তো দেশবাড়ির গল্প করে। এতবড় দু'টো হীরের খণ্ড নিয়ে দেশে যাচ্ছে, ওরা কী সম্বর্ধনাটাই না পাবে, এসব কথাও হয়।



ফ্রান্সিস ডেক-এ একা একা পায়চারী ক'রে বেড়ায় আর ভাবে এখন নিরাপদে দেশে ফিরতে পারবে তো?

শুধু ফ্রান্সিস অনেক রাত পর্যন্ত ঘুমুতে পারে না। ডেক-এ একা-একা পায়চারী ক'রে বেড়ায় আর ভাবে এখন নিরাপদে দেশে ফিরতে পারবে তো? পথে জলদস্যুদের ভয় আছে, প্রবল সামুদ্রিক ঝড়ে জাহাজ ডুবি হওয়াও বিচিত্র নয়। তবে লক্ষণ ভাল। সমুদ্র শান্ত, বাতাসও বেগবান। পালগুলো ফুলে উঠেছে। দ্রুত গতিতে জাহাজ চলেছে। আর দাঁড় বাইতে হচ্ছে না। কিছুদিনের মধ্যেই দেশে পৌঁছানো যাবে। কিন্তু শান্ত আর নিরুপদ্রব সমুদ্রযাত্রা ফ্রান্সিসের ভাগ্যে নেই। এটা ও কয়েকদিন পরেই বুঝতে পারলো।

* *

সেদিন অমাবস্যার রাত। কালো আকাশ, সমুদ্র সব একাকার। মাথার ওপর শুধু কোটি-কোটি তারার ভীড়। তারাগুলো জ্বল্‌জ্বল করছে। পরিস্কার, নির্মল আকাশ।

তখন মধ্যরাত্রি। এতক্ষণ ডেকে একা-একা পায়চারী করছিল ফ্রান্সিস। কিছুক্ষণ আগে কেবিনে ফিরে এসেছে। ঘুমিয়ে পড়েছে একটু পরেই। জাহাজে সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে।

শুধু হীরের গাড়ি দু'টো পাহারা দিচ্ছে দু'জন ভাইকিং। তারাও এতক্ষণ গল্পগুজব ক'রে গাড়ির চাকায় ঠেসান দিয়ে এখন তন্দ্রায় আচ্ছন্ন।

অন্ধকার সমুদ্রের মধ্য দিয়ে একটা পর্তুগীজ জলদস্যুর জাহাজ নিঃশব্দে ওদের জাহাজের গায়ে এসে লাগল। সেই ধাক্কায় একজন পাহারাদারের তন্দ্রা ভেঙে গেলেই হাঁই তুলে চোখ তুললো। কেবিনের সামনে একটা কাঁচে ঢাকা লন্ঠনের আলো জ্বলছিল। হঠাৎ সেই আলোয় ও দেখলো কারা যেন হাতে খোলা তরোয়াল নিয়ে ওর দিকে এগিয়ে আসছে। এত রাত্রে এরা আবার কারা ? ভুল দেখছে মনে ক'রে ও দু'চোখ কচ্লে নিলো ! আর সত্যিই তো। মাথায় ফেট্টি বাঁধা, বুকে-হাতে উল্কি আঁকা একটা লোক এগিয়ে আসছে। পেছনে আরো ক'জন। জলদস্যু ! আতঙ্কে ও চিৎকার ক'রে উঠতে গেল । কিন্তু পারল না। তরোয়ালের এক আঘাতে ও ডেক-এ লুটিয়ে পড়ল। ওর সঙ্গীটির যখন তন্দ্রা ভাঙল দেখলো, কয়েকটা বলিষ্ঠ হাত ওকে দ্রুত দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলছে। চিৎকার ক'রে উঠে কি হচ্ছে সেটা বলবার আগেই ওকে হীরের গাড়ির চাকার সঙ্গে বেঁধে ফেলা হলো।

তারপর জলদস্যুরা ছুটলো কেবিনঘরগুলোর দিকে। তার মধ্যে দু'জন অস্ত্রশস্ত্র রাখার ঘরের সামনে পাহারায় দাঁড়িয়ে গেল, যাতে কেউ এখান থেকে অস্ত্র না নিয়ে যেতে পারে। কেবিন ঘরে সবাই অঘোরে ঘুমুচ্ছিল। হঠাৎ তরোয়ালের খোঁচা খেয়ে সবাই একে-একে উঠে বসলো। সামনে তাকিয়ে দেখলো মাথায় ফেট্টি বাঁধা বড়-বড় গোঁফ আর বড়-বড় জুলপীওলা জলদস্যুরা দাঁড়িয়ে। হাতে খোলা তলোয়ার। যুদ্ধ করা দূরে থাক, কেউ অস্ত্রাগারের দিকে পা বাড়াতে পারল না। ফ্রান্সিস-হ্যারিরও এক অবস্থা। এখন ওদের সঙ্গে লড়্তে যাওয়া মানে স্বেচ্ছায় মৃত্যুকে ডেকে আনা। জলদস্যুদের দলের একজন বেঁটে মত লোক এগিয়ে এসে পর্তুগীজ ভাষায় সবাইকে বললো—'সবাই ওপরে ডেকে-এ চলো।'

সবাইকে সার বেঁধে ওপরে ডেক-এ আনা হলো। ডেক-এর একপাশে সবাইকে বসতে বলা হলো। ওরা যখন বসলো, তখন বেঁটে জলদস্যুটা চিৎকার ক'রে কী যেন বলে উঠলো। সঙ্গের জলদস্যুরাও একসঙ্গে চিৎকার ক'রে উঠল। ওদের ক্যারাভেল জাহাজ থেকেও আর একদলের চিৎকার শোনা গেল। ভাইকিংরাও বুঝলো, এটা ওদের জয়ধ্বনি। বেঁটে জলদস্যুটা এবার চিৎকার ক'রে বলতে লাগল—'তোমাদের এখানেই থাকতে হবে। কাল সকালে আমাদের ক্যাপ্টেন লা ব্রুশ এই জাহাজে আসবেন। তিনি যা বিবেচনা করবেন, তোমাদের ভাগ্যে তাই ঘটবে। এখন চুপচাপ ব'সে থাকো। চাও কি ঘুমুতেও পারো। কিন্তু কেউ যদি বেশী চালাকি দেখাতে যাও, তাহ'লে তার মুণ্ডু উড়িয়ে দেবো।'

একমাত্র বেঁটে জলদস্যুটার গায়ে ডোরাকাটা গেঞ্জি। ও পেটের কাছ থেকে গেঞ্জীটা একটু তুলে মুখ মুছে নিলো। ভাইকিংদের ঘিরে আট-দশ জন জলদস্যু খোলা তরোয়াল হাতে পাহারা দিতে লাগল। এদিকে ক্যাপ্টেন লা ব্রুশের নাম শুনে ভাইকিংদের মধ্যে গুঞ্জন শুরু হলো। লা ব্রুশের নাম শোনেনি, এমন লোক এই তল্লাটে নেই। লা ব্রুশ জাতিতে ফরাসী, একটা পা কাঠের। ওর মত নৃশংস-নির্মম জলদস্যুকে সকলেই যমের মত ভয় করে। ও জাহাজ লুট ক'রে শুধু ধনরত্নই নেয় না, জাহাজের লোকেদের ধ'রে ক্রীতদাসের হাটে বিক্রী করে। ভাইকিংরা বেশ ভীত হলো। ভাগ্যে কী আছে, কে জানে ? বেঁটে জলদস্যুর কথাগুলো ফ্রান্সিস, হ্যারি শুনল। হ্যারি-ফ্রান্সিসের কাছে ঘেঁসে এসে বসে

চাপাস্বরে ডাকলো—ফ্রান্সিস ?

—হুঁ।

—আমরা তাহ'লে কুখ্যাত জলদস্যু লা ব্রুশের পাল্লায় পড়লাম।

—'হুঁ'।

—'এখন কি করবো ?' হ্যারি জিজ্ঞাসা করল।

—'কিছু করবার নেই। সময় আর সুযোগের সন্ধানে থাকতে হবে।' একটু থেমে ধরা গলায় ফ্রান্সিস বললো, 'আমার সবচেয়ে দুঃখ কি জানো ? এত দুঃখকষ্ট সহ্য ক'রে এক বন্ধুর প্রাণের বিনিময়ে যে হীরে দু'টো আনলাম, সেটা লা ব্রুশের মত একটা জঘন্য জলদস্যুর সম্পত্তি হয়ে যাবে।'

—ফ্রান্সিস জলদস্যুর দল এখনো জানে না ঐ গাড়ি দু'টোয় কী আছে। সূর্য উঠলে ওরা হীরে দু'টো চিনে ফেলবে। সূর্য ওঠার আগেই আমাদের একটা উপায় বার করতে হবে, যাতে ওরা হীরের খণ্ড দু'টোকে না চিনে ফেলে।

—'তুমি কিছু ভেবেছো ?' ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করল।

—'হ্যাঁ, বুদ্ধি ক'রে হীরে দুটোকে ঢাকা দিতে হবে।' হ্যারি বললো।

—কিন্তু কী ক'রে ?

—তুমি ওদের বেঁটে সর্দারটাকে গিয়ে বলো, যে গাড়ি দু'টোয় বারুদ আছে। বৃষ্টি হ'লে বারুদ ভিজে যাবে। কাজেই ছেঁড়া পাল দিয়ে গাড়ি দু'টো ঢাকতে হবে।

ফ্রান্সিস একমুহূর্ত হ্যারির দিকে হেসে কাঁধে এক চাপড় দিলো—'জব্বর উপায় বের করেছো। বলছি এক্ষুণি, কিন্তু ও ব্যাটা রাজি হবে কি ?'

—রাজি হবে। তুমি কিন্তু এরকম ভাব করবে যে ঢাকা দিলেও হয়, না দিলেও হয়। সাবধান বেশি আগ্রহ দেখাবে না। তাহ'লে, ওদের মনে সন্দেহ হ'তে পারে।

—দেখি, ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল। ফ্রান্সিসকে উঠে দাঁড়াতে দেখে একজন পাহারাদার তরোয়াল উঁচিয়ে ছুটে এল। ফ্রান্সিস দু'হাত ওপরে তুলে দিল। পাহারাদার এসে বাজখাঁই গলায় বলল—'কি হলো তোমার' ?

—আমাকে ক্যাপ্টেনের কাছে নিয়ে চলো, বিশেষ জরুরী কথা আছে।

—ক্যাপ্টেন এখন ঘুমুচ্ছে। যা বলবার কাল সকালে বলবে।

—না, এখুনি দেখা করতে হবে।

পাহারাদারটা মুখ ভেংচে উঠল—'কোথাকার রাজা হে তুমি, যখন খুশী লা ব্রুশের সঙ্গে দেখা করতে চাও—তোমার ভাগ্য ভালো যে এখনো তোমার মাথাটা শরীরের সঙ্গে লেগে আছে, উড়ে যায় নি।'

ফ্রান্সিস একবার ভাবলো, লোকটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে উচিত শিক্ষা দেবে কিনা ! পরমুহূর্তে ভাবলো, মাথা গরম করলে সব কাজ পণ্ড হ'য়ে যাবে। আগে হীরে দুটোকে ঢাকতে হবে।

ফ্রান্সিস হেসে বলল—'ভাই তোমরা হচ্ছো বীরের জাত, আমাদের মত ভীতু-দুর্বল লোকেদের ওপর কি তোমাদের চোখ রাঙানো উচিত।'

পাহারাদারটাও হেসে গোঁফ মুচরে বলল—'তুমি বড় সর্দারের সঙ্গে কথা বলতে পারো'।

ডোরাকাটা গেঞ্জী গায়ে বেঁটে লোকটাই বড় সর্দার। সে কথা কাটাকাটি শুনে এগিয়ে এসে মোটা গলায় বলল—'কী হয়েছে!'

ফ্রান্সিস বড় সর্দারকে হাত তুলে সম্মান দেখাল। তারপর বললো—'দেখুন, একটা সমস্যার কথা বলছিলাম।'

—'কী সমস্যা?

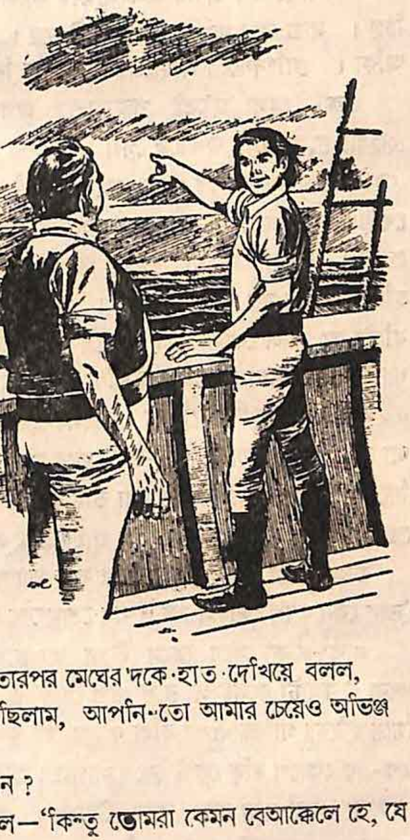
হীরে রাখা গাড়ি দু'টোর দিকে হাত দেখিয়ে ফ্রান্সিস বললো—'ঐ গাড়ি দু'টোয় প্রচুর বারুদ রাখা আছে। বৃষ্টি হলে সব বারুদ ভিজে যাবে। যদি ছেঁড়া পাল-টাল দিয়ে ঢেকে দেওয়ার অনুমতি দেন তাহ'লে'—

—'পাগল নাকি? পরিস্কার আকাশ—বৃষ্টি হবে না'—বড় সর্দার বললো।

—বলছিলাম, আপনি তো আমার চেয়েও অভিজ্ঞ, জানেন তো ভূমধ্যসাগরের কাছাকাছি এসব জায়গায় কখন মেঘ ঝুঁক'রে, কখন ঝড় হয়, বৃষ্টি হয়, মা মেরীও তা জানেন না।

বড় সর্দার ভেবে বললো, 'হুঁ।'

—তাছাড়া ভেবে দেখুন, আমি শুধু আমাদের জন্য বলছি না, আমাদের আর বারুদ দিয়ে কি হবে কিন্তু আপনাদের তো যুদ্ধ-টুদ্ধ করতে হবে, ভেজা বারুদ নিয়ে তখন কী করবেন?



তারপর মেঘের দিকে হাত দেখিয়ে বলল,
বলছিলাম, আপনি তো আমার চেয়েও অভিজ্ঞ

—'হুঁ, তা ঠিক।' বড় সর্দার মাথা ঝাঁকাল—'কিন্তু তোমরা কেমন বেআক্কেলে হে, যে খোলা ডেকে বারুদ রেখেছো?'

—ভিজে গিয়েছিল তাই শুকোতে দিয়েছিলাম।

—'অ'। যাও, ঢাকা দিয়ে দাও।

ফ্রান্সিস হ্যারিকে ডাকল। হ্যারি কাছে এলে চোখ টিপে বললো—'কেল্লা ফতে! ক্যাপ্টেন রাজী হয়েছে।'

ও আরো কয়েকজনকে ডাকল। তারপর গুদোম ঘর থেকে দু'টো বড়-বড় ছেঁড়া পালের অংশ এনে ঢাকা দিতে শুরু করলো। বড় সর্দার দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল। প্রায় অন্ধকারে ও কিছুই বুঝতে পারছিল না। পাল ঢাকা দিয়ে ফ্রান্সিসরা দড়ি-দড়া দিয়ে শক্ত করে হীরেটাকে গাড়ির সঙ্গে বেঁধে দিলো। ওদের কাজ সারতেই ভোর হয়ে গেল।

ভাইকিংদের মধ্যে যারা জেগে ছিল, তারা হীরের গাড়ির দিকে তাকিয়ে রইলো। কিন্তু আর আলোর খেলা দেখা গেল না। পাল দিয়ে ঢাকা হীরে থেকে দ্যুতি বেরোবে কি ক'রে? জলদস্যুরাও গাড়ি দু'টো বারুদের গাড়ি ভেবে তাকিয়ে দেখলো না। ফ্রান্সিস আর হ্যারির মুখে সাফল্যের হাসি ফুটে উঠলো। যাক্—হীরে দু'টোকে জলদস্যুদের হাত থেকে এখন আপাততঃ বাঁচানো গেছে।

সকাল হলো। এবার জলদস্যুদের ক্যারাভেল জাহাজটা দেখা গেল। পালের গায়ে ক্রশ চিহ্ন। মাস্তুলের মাথায় পতাকা উড়ছে। কালো কাপড়ের মাঝখানে মানুষের কংকাল আঁকা। ফ্রান্সিসদের জাহাজের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধা।

একটু বেলা হ'তেই পাহারাদার জলদস্যুদের মধ্যে ব্যস্ততা দেখা গেল। বড় সর্দার একবার দ্রুত ওদের জাহাজে গেল। তারপর দ্রুতপায়ে ফিরে এলো। জলদস্যুদের মধ্যে বেশ একটা সাজো-সাজো রব পড়ে গেল। একটু পরেই কাঠের পায়ে ঠক্-ঠক্ শব্দ তুলে একটু খোঁড়াতে-খোঁড়াতে এই জাহাজে এলো লা ব্রুশ। মাথায় বাঁকানো টুপী। গালপাট্টা দাড়ি গোঁফ। কালো জোববা পরনে, তাতে সোনালী জরির কাজ করা, গলায় ঝুলছে একটা হাঁসের ডিমের মত মুক্তোর লকেট। কোমরে মোটা বেল্ট। তাতে হাতীর দাঁতে বাঁধানো বাঁটের তরোয়াল ঝোলানো। পায়ে হাঁটু অবধি ঢাকা বুট, অন্য পা-টা কাঠের। ডানহাতে ধরা একটা শেকল। শেকলে বাঁধা একটা বাচ্চা চিতাবাঘ। লা ব্রুশ খুব ধীর পায়ে এসে এই জাহাজের ডেক-এ দাঁড়াল। জলদস্যুরা সব চুপ করে পুতুলের মত দাঁড়িয়ে রইলো। লা ব্রুশ একবার চোখ পিট্-পিট্ করে চারিদিকে তাকিয়ে নিলো। তারপর ভাইকিংদের দিকে তাকিয়ে বলল—'তোমরা ভাইকিং, ভালো জাহাজ চালাও, ভালো যুদ্ধ করো, কিন্তু তোমরা বড় দরিদ্র, তোমাদের এই জাহাজে মূল্যবান কিস্সু পাবো না।'

ভাঙা-ভাঙা পর্তুগীজ ভাষার সঙ্গে ফরাসী ভাষা মিশিয়ে লা ব্রুশ বলতে লাগলো—'তবে কেন আশী মাইল সমুদ্র পথ তোমাদের পেছনে ধাওয়া করে এলাম?'

খুক্-খুক্ করে হেসে উঠল লা ব্রুশ। তারপর হাসি থামিয়ে বলল—'সেটা এই জন্যে।' কথাটা বলেই লা ব্রুশ খাপ থেকে তরোয়াল খুল্লো। তারপর বেশ দ্রুত ছুটে গিয়ে হীরের গাড়ির ওপর বাঁধা দড়িগুলো কাটতে লাগলো। অত্যন্ত ধারালো তরোয়ালের এক-এক কোপে দড়ি কেটে যেতে লাগল। তারপর ওখান থেকে সরে এসে ভাইকিংদের দিকে তাকিয়ে খুক-খুক করে হেসে উঠলো। ফ্রান্সিস ও হ্যারি পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলো। তবে কী লা ব্রুশ হীরের কথা জানে? লা ব্রুশ হঠাৎ চিৎকার করলো—'ওপরের ঢাকনা সরাও।'

তিন-চারজন জলদস্যু ছুটে গিয়ে ছেঁড়া পাল দুটো খুলে ফেলল। সূর্যের আলোয় ঝিকিয়ে উঠল হীরে দু'টো। নীল্‌চে-হলুদ কত রকমের আলো বিচ্ছুরিত হ'তে লাগল। ভাইকিংরা কেউ অবাক হলো না। কারণ, এসব রঙের খেলা ওরা অনেকদিন দেখেছে। অবাক হল জলদস্যুরা। ওরা হাঁ করে তাকিয়ে রইলো। চোখে পলক পড়ে না। লা ব্রুশও কম অবাক হয় নি। এত বড় হীরে? ওর কল্পনারও বাইরে। কিছুক্ষণ চুপ ক'রে হীরে দুটোর দিকে তাকিয়ে রইলো লা ব্রুশ। তারপর ভাইকিংদের দিকে তাকিয়ে লা ব্রুশ বলতে লাগল—'তেকরুর বন্দরের কাছে যে দুর্গ আছে, সেখান থেকে হেনরী সময়

মতই আমার কাছে লোক পাঠিয়ে ছিল। তোমরা ওকে ভাঁওতা দিয়ে হীরে নিয়ে পালাচ্ছো, এই সংবাদ পেতেই তোমাদের পিছু নিলাম। আমাদের 'ক্যারাভেল' জাহাজ যে অনেক দ্রুত গতিসম্পন্ন, সেটা আর একবার প্রমাণিত হলো।' খুক্-খুক্ করে হেসে উঠল লা ব্রুশ।

ফ্রান্সিসের আর সহ্য হ'ল না। ও আস্তে-আস্তে উঠে দাঁড়াল। হ্যারি ওকে বারণ করতে গেল। কিন্তু ফ্রান্সিস শুনল না। ও উঠে দাঁড়িয়ে বললো—'ক্যাপ্টেন লা ব্রুশ আমার কিছু বলবার আছে।'

দু'তিন জন পাহারাদার তরোয়াল হাতে ছুটে এলো। লা ব্রুশ হাত তুলে ওদের থামিয়ে দিল। বললে—'বলো'।

—দুর্গাধ্যক্ষ হেনরী মিথ্যে অভিযোগ করেছেন। আমরা তাঁকে ভাওতা দিতে চাই নি। তিনি আমাকে প্রাণে বাঁচিয়েছিলেন। তার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। তাকে এক খণ্ড হীরে দিয়েছিলাম। কিন্তু লোভের বশে তিনি দু'টো খণ্ডই জোর ক'রে নিতে গিয়েছিলেন। আমরা সেটা হ'তে দিই নি। কারণ হীরের দু'টো খণ্ডই আমাদের প্রাপ্য। আমরাই হীরের পাহাড়ের খোঁজ জানতাম। আমার এক বন্ধু এই জন্য প্রাণ দিয়েছে। কাজেই এই হীরের নায্য দাবীদার আমরা। হেনরীকে এই হীরে পেতে বিন্দুমাত্র কষ্টও স্বীকার করতে হয় নি। তবে কি করে উনি বলেন, যে আমরা ওকে ভাঁওতা দিয়েছি।

লা ব্রুশ কী ভাবল। তরোয়ালের হাতলে হাত বুলোল দু'একবার। দাড়িতে হাত বুলিয়ে, তারপর কেশে নিয়ে বললো—'ওসব তোমাদের ব্যাপার। হীরে দু'টো আমি পেয়েছি, ব্যস।' বলে ব্রুশ চোখ পিট-পিট্ করে হাসল।

—আমাদের কি হবে ?

—তোমাদের আমার জাহাজে কয়েদ ঘরে থাকতে হবে।

—কেন ?

লা ব্রুশ খুক্-খুক্ ক'রে হাসল—'তোমরা যে বেঁচে আছো, এই জন্য মা মেরীকে ধন্যবাদ দাও। তোমাদের যে প্রাণে মারতে বলিনি, তার কারণ এই হীরে দু'টো। তোমাদের নিয়ে আমরা প্রথমে যাবো ডাইনীর দ্বীপে। সেখানে লুটের মাল রেখে যাবো চাঁদের দ্বীপে। তারপর ইউরোপের দিকে। ক্রীতদাস বিক্রীর হাটে তোমাদের বিক্রী করবো। এরমধ্যে অবশ্য ভালো খদ্দের পেলে হীরে দু'টোও বিক্রী করে দেব'।

—আমাদের বিক্রী-করা হবে কেন ?

লা ব্রুশ ক্রুদ্ধ স্বরে ব'লে উঠল—'তুমি যে এখনো আমার সঙ্গে কথা বলতে পারছো, জেনো সেটা আমার দয়া।'

হ্যারি ফ্রান্সিসের হাত ধরে টানল—'ফ্রান্সিস মাথা গরম করো না। ব'সে পড়ো।'

ফ্রান্সিস বসে পড়ল। লা ব্রুশ বড় সর্দারের দিকে তাকিয়ে বলল—'এদের সব কয়েদ ঘরে ঢোকাও। তারপর এই জাহাজটাকে আমাদের ক্যারাভেলের পেছনে বেঁধে নাও।'

লা ব্রুশ আর কোনদিকে না তাকিয়ে কাঠের পা ঠক্-ঠক্ করতে-করতে নিজের ক্যারাভেলে-এ ফিরে গেল।

বড় সর্দার চেঁচিয়ে হুকুম দিলো—'সব ক'টাকে কয়েদ ঘরে ঢোকাও। পাহারাদার জলদস্যুরা সব এগিয়ে এলো। ভাইকিংদের সারি বাঁধা হলো। ক্যারাভেলে নিয়ে যাওয়া হ'ল

লোকটার জন্যে ফ্রান্সিসের সহানুভূতি হলো। কে জানে কতদিন এই পশুর জীবন কাটাচ্ছে লোকটা ? ও হ্যারিকে বলল—'হ্যারি, জিজ্ঞেস করতো—ওর নাম কি' ?

হ্যারি জিজ্ঞেস করতে, লোকটা ফ্যাস্‌ফেসে গলায় বলল—'ফ্রেদারিকো।'

—'তুমি কি পর্তুগীজ ?' হ্যারি জিজ্ঞেস করলো।

—'না স্প্যানিশ, তবে পর্তুগীজদের সঙ্গে থেকে-থেকে ওদের ভাষাতেই কথা বলা অভ্যেস হ'য়ে গেছে'।

কথাটা ব'লে ফ্রেদারিকো কোমর থেকে কী বের ক'রে মুখে দিয়ে চিবোতে লাগল। হ্যারি জিজ্ঞেস করল—'কি চিবুচ্ছো ?'

—তামাকপাতা।

—এখানে তামাকপাতা পেলে কি ক'রে ?

ফ্রেদারিকো খ্যাক্ খ্যাক্ ক'রে হেসে উঠল। মাথায় আঙুল ঠুকে বললো—'বুদ্ধি-টুদ্ধি খরচ করলে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে'।

তারপর আস্তে-আস্তে বললো—'ঐ যে পাহারাদারটাকে দেখছো পাথরের মত মুখ, মনে হয় দয়া-মায়া ব'লে কোন জিনিস ওর মনে নেই।''

—ওর মুখ দেখে তো তাই মনে হয়।

—ঠিক। কিন্তু ওরও বৌ-ছেলেমেয়ে আছে। ওর মনেও স্নেহ-ভালোবাসা আছে। ওর নাম বেনজামিন। ও মাঝে-মাঝে হাত দেখায়। একবার একদল জিপসীদের সঙ্গে আমি বেশ কিছুদিন ছিলাম। ভালই হাত দেখতে শিখেছিলাম। বেন্‌জামিন হাত দেখায়, আর আমি ওকে ওর বৌ-ছেলেমেয়ের খবরাখবর ব'লে দিই। ব্যস, বেনজামিন এতেই খুশি।'

ফ্রেদারিকো একটু থেমে বললো একবার লিসবনের কাছে দিয়ে এই ক্যারাভেলটা যাচ্ছিল, আমি ওর হাত দেখে বললাম—'তুমি শিগ্‌গির বাড়ি যাও,তোমার ছেলের মরণাপন্ন অসুখ।'

ও লা ব্রুশের কাছে ছুটি নিয়ে লিসবনে ওর বাড়িতে ছুটে গেল। দেখল, সত্যিই ছেলেটি মারা-যায় যায়। চিকিৎসা-টিকিৎসার পর ছেলেটি সুস্থ হ'ল। বেনজামিন আবার ফিরে এল। ব্যস্। তারপর ওর কাছে আমার কদর বেড়ে গেল। যা চাই, তাই এনে দেয়। লুকিয়ে আমার জন্য মাংস-টাংস নিয়ে আসে'।

—তাহ'লে তো ওদের সাহায্যে তুমি পালাতেও পারো।

—তা' পারি। কিন্তু লা ব্রুশ মাঝে-মাঝেই আমার কাছে আসে। প্রতিদিন আমার খোঁজ করে। যদি কোনদিন এসে দেখে আমি পালিয়েছি, প্রথমেই বেন্‌জামিনের গর্দান যাবে। অন্য পাহারাদার যে দু'জন আছে, তাদের হাঙরের মুখে ছুঁড়ে ফেলে দেবে।

—'লা ব্রুশ তোমার কাছে আসে কেন' ? হ্যারি জানতে চাইলো।

—'সে অনেক ব্যাপার !'

ফ্রেদারিকো আর কোন কথা বলল না। চোখ বন্ধ করে তামাকপাতা চিবুতে লাগল। এক সময় হ্যারি লক্ষ্য করল ফ্রেদারিকো গলায় লকেটের মত ঝোলানো একটা কী যেন বের করল। তারপর মুখের কাছে ধ'রে দাঁত-মুখ খিঁচোতে লাগল। হ্যারি দেখলো, ওটা একটা আয়নার ভাঙ্গা টুকরো। গলার সঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধা। একদিকের ভাঙা মুখটা ছুঁচোলো। ফ্রেদারিকো আয়নাটার মুখ দেখছে আর ভেংচি কাটছে। ওর কাণ্ড দেখে হ্যারির

ওদের। ডেক থেকে কাঠের সিঁড়ি নেমে গেছে। ওরা নামতে লাগল। অনেক ক'টা ধাপের পর—ক্যারাভেলের সবচেয়ে নীচের অংশে একটা লম্বা ঘর। লোহার মোটা-মোটা শিক লাগানো। ঘরটার জানালা বলে কিছুই নেই। ঐ শিকল লাগানো দরজা থেকেই যেটুকু আলো আসে। স্যাৎসেঁতে অন্ধকার। বাইরের আলো থেকে এসে কিছুই নজরে পড়ে না। অন্ধকার স'য়ে আসতে ওরা দেখল লম্বা ঘরটার ধার বরাবর একটা মোটা শেকল। শেকলের দু'টো দিক। একদিকে জাহাজের কাঠের খোলের সঙ্গে গাঁথা। অন্য দিকটা একটা বড় কড়ার সঙ্গে আটকানো। বড় সর্দার সেই দিকে শেকলটার মুখ একটা আংটা থেকে খুলে নিলো। এদিকে কোণের দিকে একজন জলদস্যু দাঁড়িয়ে। সে প্রত্যেকের হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিয়ে এক-এক ক'রে চাবি দিয়ে হাতকড়া আটকে দিতে লাগল। বড় সর্দার এক একজনের হাত কড়ার মধ্যে দিয়ে শেকলের মুখটা ঢুকিয়ে দিতে লাগল। হাতকড়ার মধ্যে দিয়ে শেকল বাঁধা অবস্থায় ওরা পরপর বসতে লাগল। যখন সবাইকে এ ভাবে বসানো হলো, তখন বড় সর্দার শেকলটা একটা আংটার মধ্যে আটকে দিয়ে যে হাতকড়া পরাচ্ছিল, তাকে ডাকল। সে এসে শেকলটা চাবি দিয়ে এঁটে দিল। বোঝা গেল, এই লোকটাই কয়েদ ঘরের পাহারাদার। ও-ই বন্দীদের সব দেখাশুনা করে। অদ্ভুত দেখতে লোকটা। যেমন কালো চেহারা, তেমনি মুখটা। মুখটা যেন আগুনে পোড়া তামাটে কালো। এমন ভাবলেশহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে, যেন কিছুই দেখছে না, শুনছে না। মুখ দেখলে মনে হয় যেন জীবনে কোনদিন হাসে নি। মাথায় ঝাঁকড়া চুল। একেবারে নরকের প্রহরী। এতক্ষণে হাতকড়া শেকলের ঝন্ ঝন্ শব্দ বন্ধ হলো। তবু ভাইকিংদের মধ্যে কেউ উঠে দাঁড়ালে শেকলে ঝন্ ঝন্ শব্দ উঠেছে। এতক্ষণে চোখে অন্ধকার সয়ে আসতে ফ্রান্সিস চারিদিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল। যে ভাবে শেকল বাঁধা হাতকড়ি পরানো তা'তে এসব ভেঙে পালানো অসম্ভব, দু'দিকে নিরেট কাঠের খোল। দরজায় মোটা গরাদ। ফ্রান্সিসের মন দমে গেল। শেষে ক্রীতদাসত্বকে মেনে নিয়ে জীবন শেষ করতে হবে? ও এই সব ভাবছে, তখনই শুনল প্রায় অন্ধকার কোন থেকে কে ফ্যাস্‌ফেসে গলায় চেঁচিয়ে উঠল—'উ, —উ গেলাম—পা মাড়িয়ে দিয়েছে—ও হোহো—।'

ফ্রান্সিস ভালো করে তাকিয়ে দেখলো—কোণার দিকে একটা লোক পায়ে হাতে বুলোচ্ছে আর চ্যাঁচাচ্ছে। এই লোকটা তো আমাদের দলের নয়, ফ্রান্সিস ভাবলো। তাহ'লে এই লোকটা আগে থেকেই শেকল বাঁধা ছিল। পুরানো কয়েদী। হাতে শেকল আটকানো; ও এগিয়ে যেতে পারল না। ঐ লোকটার পাশেই ছিল হ্যারি। লোকটার পায়ে হাঁটুতে হাত বুলোতে-বুলোতে বললো—'খুব লেগেছে? অন্ধকারে দেখতে পাইনি'।

লোকটা এতক্ষণে শান্ত হলো। দু'একবার উ—হু—হু করে চুপ করলো।

হ্যারি জিজ্ঞেস করল—'তুমি ভাই কদ্দিন এখানে আছো?'

লোকটা বলল—এখানে কি দিন-রাত বোঝা যায়, যে দিন-মাস-বছর গুণবো?

এবার ফ্রান্সিস লোকটার দিকে ভালো করে তাকাল। দেখলো, লোকটার মাথাভর্তি লম্বা লম্বা কাঁচাপাকা চুল। মুখে কাঁচাপাকা দাড়ি গোঁফের জঙ্গল। গায়ে শতচ্ছিন্ন একটাজামা। পরণে ছেঁড়া পায়জামা। প্রায় বুড়ো এই মানুষটা ক্রীতদাসের হাটে হয়তো ভালো দামে বিকোবে না। তাই হয়তো একে এখনও কয়েদঘরে রেখে দিয়েছে, মরে গেলে সমুদ্রে ফেলে দেবে।

হাসি পেলো। বললো—'এই অন্ধকারে মুখ দেখতে পাচ্ছো?'

—'পারছি বৈ কি'! ফ্রেদারিকো হাসলো—'কিছুদিন থাকো, বেড়ালের মত অন্ধকারে তুমিও দেখতে পাবে। তখন আর আলো সহ্য হবে না। আলোর সামনে চোখ জ্বালা করবে। চোখ জলে ভরে যাবে।'

হ্যারি ভাবল, সত্যিই দীর্ঘদিন এভাবে অন্ধকার কয়েদ ঘরে পড়ে থাকলে বাইরের আকাশ-মাটি-জলের কথা ভুলেই যেতে হবে।

ফ্রান্সিসদের কয়েদ ঘরের বন্দীজীবন কাটলো কয়েকদিন। দু'বেলা খাওয়া জুটল পোড়া পাঁউরুটি, আর আলু-মুলো এবং আনাজ মেশানো ঝোল। বেনজামিনই ওদের খাবার-দাবার জল দেয়। বেনজামিনকে আরো দু'জন পাহারাদার সাহায্য করে। ফ্রেদারিকো কিন্তু মাংস, সামুদ্রিক মাছের ঝোল, এসব খেতে পায়। ওর বেলা বেশ ভালো ফুলকো রুটি। হ্যারি বুঝল, ফ্রেদারিকো বেন্‌জামিনের হাত দেখেই বেশ সুবিধে করে নিয়েছে।

ফ্রান্সিসদের কয়েদ ঘরের জীবন এভাবেই কাটতে লাগল। দিন যায়, রাত যায়। দিন-রাতের পার্থক্যও ওরা ভালোভাবে বুঝতে পারে না! দরজাটার পেছনে অন্ধকার না থাকলে বোঝে দিন, আর ওদিকটা অন্ধকার হ'লে বোঝে রাত্রি। ফ্রেদারিকোর সঙ্গে হ্যারির আর কোন কথাবার্তা হয়নি, ফ্রেদারিকো শুধু তামাক পাতা চিবোয় আর ঝিমোয়। আর মাঝে-মাঝে আয়নার ভাঙা টুকরোটা বের করে মুখ দেখে। মুখ ভ্যাংচায়। আপন মনেই বিড়-বিড় ক'রে কী বলে আর ঝিমোয়।

* * *

একদিন। তখন দিনই হবে। কারণ গরাদ দেওয়া দরজার ওপাশে আলোর আভাস ছিল। হঠাৎ বেন্‌জামিন আর দু'জন পাহারাদারকে খুব সন্ত্রস্ত মনে হ'লো। বেন্‌জামিন এক সময় ফ্রেদারিকোর কানের কাছে মুখ নিয়ে কী সব ফিস্‌ফিস্ করে ব'লে গেল।

একটু পরেই গরাদ দেওয়া দরজার কাছে খট্ খট্ শব্দ উঠল। লা ব্রুশ আসছে বোঝা গেল। দরজা খুলে পাহারাদারেরা স'রে দাঁড়াল। লা ব্রুশ কাঠের পাঠাতনে ঠক্-ঠক্ শব্দ তুলে এগিয়ে এল। ওর হাতে একটা শঙ্কর মাছের চাবুক। আর কারো দিকে না তাকিয়ে লা ব্রুশ ফ্রেদারিকোর সামনে এসে দাঁড়াল। গম্ভীরগলায় ডাকল 'ফ্রেদারিকো।'

—'আজ্ঞে—' ফ্রেদারিকো আস্তে-আস্তে উঠে দাঁড়াল। ও যেন কাঁপছে। কেমন ভীত-সন্ত্রস্ত ওর ভাবভঙ্গী।

—'তাহ'লে কি ঠিক করলে। পনেরো দিন সময় চেয়েছিলে। সে সময় পেরিয়ে গেছে।'

ফ্রেদারিকো ফ্যাসফেসে গলায় বলল—'আমি সত্যিই কিছু জানি না।'

—'তুমি সব জানো। মুক্তোর সমুদ্র থেকে অক্ষত দেহে বেরোবার উপায় একমাত্র তুমিই জানো'।

—'আমি যা জানি 'সবই আপনাকে বলেছি।'

ফরাসী ভাষায় গালাগাল দিয়ে লা ব্রুশ চাবুক চালাল। চাবুকের ঘায়ে ফ্রেদারিকো পড়ে যেতে-যেতে কোন রকমে দাঁড়িয়ে রইল। লা ব্রুশ ওর গলায় ঝোলানো লকেটের হাঁসের ডিমের মতো মুক্তোটা দেখিয়ে বলল, 'বল; এটা তুই কী ক'রে আনলি'?

ফ্রেদারিকো পিঠে হাত বুলোতে-বুলোতে বলল—'ভাজিম্বাদের রাজার ভাণ্ডার থেকে

চুরি করে এনেছি'।

'মিথ্যে বলছিস্।' লা ব্রুশ বাঘের মতো গর্জন করে উঠল। আবার চাবুক পড়ল ফ্রেদারিকোর গায়ে। একটা অস্পষ্ট গোঙানির শব্দ উঠল ওর গলায়। একে বয়েসের ভারে জীর্ণ-শীর্ণ শরীর; তার ওপর এই চাবুকের মার। ফ্রেদারিকোর শরীর কাঁপছে তখন। ফ্রান্সিসের আর সহ্য হল না। ও দ্রুত উঠে দাঁড়াল হাতকড়া বাঁধা হাতটা তুলে বলল— 'ওকে আর চাবুক মারবেন না।'

লা ব্রুশ তীব্র দৃষ্টিতে ফ্রান্সিসের দিকে এক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল। তারপর দাঁত চাপাস্বরে বলল—'তাহ'লে ওর মারটা তুমিই খাও।'

প্রচণ্ড জোর চাবুক চালিয়ে চলল ফ্রান্সিসের শরীরের উপর। চাবুকের আঘাতের সঙ্গে-সঙ্গে ফ্রান্সিসের শরীর কেঁপে-কেঁপে উঠতে লাগল। কিন্তু ওর মুখ থেকে একটা কাতর ধ্বনিও বেরোল না। দাঁতে-দাঁত কামড়ে মুখ বুঁজে চাবুকের মার সহ্য করতে লাগল। লা ব্রুশ এক সময় চাবুক মারা থামিয়ে হাঁপাতে লাগল। ফ্রান্সিস শরীরের অসহ্য ব্যথায় ভেঙে পড়ল না। সোজাসুজি লা ব্রুশের চোখের দিকে তাকিয়ে রইল। ফ্রান্সিসের ওপর এই অত্যাচার দেখে ভাইকিংদের রক্ত গরম হয়ে উঠল। শেকলে প্রচণ্ড শব্দ তুলে সবাই উঠে দাঁড়াল। ফ্রান্সিসকে কয়েকজন ঘিরে দাঁড়াল। হ্যারি চেঁচিয়ে বলল—'এবার আমাদের মারুন।'

লা ব্রুশ একবার ওদের দিকে তাকাল। তীব্রদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। তারপর হাতের চাবুকটা কাঠের মেঝের ওপর ছুঁড়ে ফেলল। ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে ফ্রেদারিকোর দিকে তাকিয়ে বলল—'এই শেষবার বলছি আর পনেরো দিন সময় দিলাম। এই শেষ। এর মধ্যেই আমরা চাঁদের দ্বীপে পৌঁছব। যদি অক্ষত দেহে মুক্তোর সমুদ্র থেকে মুক্তো আনার উপায় না বলিস্, তাহ'লে হাঙরের মুখে ছুঁড়ে ফেলবো তোকে'।

বলে লা ব্রুশ কাঠের পায়ে ঠক্‌ঠক্ শব্দ তুলে চ'লে গেল।

চাবুক কুড়িয়ে নিয়ে বেন্‌জামিন ক্যাপ্টেনের পেছনে-পেছনে চ'লে গেল।

ফ্রান্সিস বসে পড়ল। কিন্তু পেছনে হেলান দিয়ে বসতে পারল না। পিঠে অসহ্য যন্ত্রণা। হ্যারি ওর জামাটা তুলে ধরল। চাবুকটা পিঠের মাংস কেটে ব'সে গেছে। সারা পিঠে কালসিটে দাগ। কিন্তু ও চোখ বুঁজে চুপ করে বসে রইল। দাঁতে-দাঁত চেপে যন্ত্রণা সহ্য করতে লাগল।

রাত্রে খাবার সময় ফ্রান্সিস বুঝলো; জ্বর এসেছে। কিছুই খেতে পারল না। কুণ্ডুলী পাকিয়ে কাঠের পাটাতনের উপর শুয়ে রইলো। অসম্ভব শীত করছে। মাথাটা ভীষণ দপ্ দপ্ করছে। পিঠের জ্বালাটা আরো বেড়েছে। ওর শরীরটা কুঁকড়ে যেতে লাগল। কিন্তু ও মুখ দিয়ে একটা শব্দ করলো না। তাই কেউ ওর শরীরের অবস্থাটা বুঝতে পারলো না। যখন ও খেতেও উঠলো না, তখন হ্যারির মনে সন্দেহ হ'ল। ও হাতকড়ি বাঁধা দু'টো হাত বাড়িয়ে ফ্রান্সিসের কপালে রাখলো। জ্বরে কপাল পুড়ে যাচ্ছে। হ্যারি ওর গালে-গলায় হাত দিল। ভীষণ জ্বর উঠেছে। হ্যারি তাড়াতাড়ি ডাকল, 'ফ্রান্সিস'।

প্রথম ডাকে সাড়া পেলো না। আবার ডাকল 'বন্ধু'—

ফ্রান্সিস মৃদুস্বরে সাড়া দিতে হ্যারি বললো—'শরীর খুব খারাপ লাগছে ?'

—'জ্বর এসেছে। সেরে যাবে।'

স্পষ্ট বোঝা গেল যে ওর গলা কাঁপছে।

কিন্তু হ্যারি বুঝলো; জ্বর এত বেশি যে ফ্রান্সিসের বোধশক্তিও লোপ পেয়েছে। আর কিছুক্ষণ পরে ও জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে। হ্যারি দ্রুত ভাবতে লাগল, ওষুধ কী ক'রে পাওয়া যায়। জ্বরটা কমাতেই হবে। ও ফ্রান্সিসের শরীরের অবস্থা অন্য কয়েকজন ভাইকিংকে বললো, কিন্তু কেউ কোন উপায় বলতে পারলো না। ওরা অসহায়ভাবে ফ্রান্সিসের কুণ্ডলী পাকানো শরীরের দিকে তাকিয়ে রইলো। হঠাৎ ওর নজর পড়লো ফ্রেদারিকোর ওপর। ফ্রেদারিকোও তখন থেকে একটানা গোঙাচ্ছে। শরীরের এই অবস্থায় ওর পক্ষে চাবুকের মার সহ্য করা সম্ভব হয়নি।

হ্যারি ভেবে দেখলো, একমাত্র ফ্রেদারিকোই পারে ফ্রান্সিসের জন্য ওষুধ আনাতে। ও যদি বেন্‌জামিনকে বলে তাহ'লেই একটা উপায় হ'তে পারে। হ্যারি ঝুঁকে পড়ে ফ্রেদারিকোকে ডাকল, 'ফ্রেদারিকো—ফ্রেদারিকো—'।

ফ্রেদারিকোর মাথাটা বুকের ওপর ঝুলে পড়েছিল। এই অবস্থাতেই ও গোঙাচ্ছিল। আরো কয়েকবার ডাকতে ফ্রেদারিকো জলে ভেজা চোখ মেলে হ্যারির দিকে তাকাল।

হ্যারি বললো, 'ফ্রেদারিকো শোন। খুব বিপদ—ফ্রান্সিসের ভীষণ জ্বর এসেছে। আর কিছুক্ষণ এই জ্বর থাকলে ও অজ্ঞান হয়ে যাবে। শীগগির একটা উপায় বের করো।'

—'কা'র জ্বর এসেছে ?'

—যে ছেলেটি তোমার হয়ে চাবুক খেলো।

—এ্যাঁ বলো কি !

হ্যারি তখন আঙ্গুল দিয়ে ফ্রান্সিসের কুণ্ডলী পাকানো শরীরটা দেখালো। ফ্রেদারিকো কাঁদো-কাঁদো স্বরে বলল—'আমাকে বাঁচাতে গিয়ে—ঈস্‌! আমি কী করি এখন ?'

ফ্রেদারিকো নিজের কষ্টের কথাও ভুলে গেল।

—বেন্‌জামিন তো তোমার কথা শোনে, ওকে একবার ব'লে দেখো।

—ভালো বলেছো, কিন্তু ও কী অতটা করবে ?

রাতের খাওয়া হ'য়ে গেছে। এঁটো থালা, গ্লাস নিতে প্রহরী দু'জন এসেছে। বেনজামিন ওদের পেছনে এসে দাঁড়াল। ওরা থালা নিয়ে বেরিয়ে গেলে দরজা বন্ধ করবে। প্রহরী দু'জন থালা-গ্লাস নিয়ে চলে গেল। চকিতে ওদের যাওয়ার পথের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বেন্‌জামিন দ্রুতপায়ে ফ্রেদারিকোর কাছে এলো। নীচু হয়ে ব'সে ফিস্‌ফিস্‌ ক'রে জিজ্ঞেস করলো—'ফ্রেদারিকো—কেমন আছো ?'

ফ্রেদারিকো মাথা নেড়ে বলল, 'আমার কথা বাদ দাও, ঐ ছেলেটাকে একটু দেখো তো, ভীষণ জ্বর এসেছে ওর।'

বেন্‌জামিন একবার ফ্রান্সিসের দিকে তাকাল। তারপর কোন কথা না ব'লে উঠে চ'লে গেল।

ফ্রান্সিস তখন জ্বরের ঘোরে বেহুঁশ। ও যেন স্বপ্নের মত স্পষ্ট দেখতে পেলো, ওদের বাড়ির বাগানটা সূর্যালোকে ঝল্‌মল্‌ করছে। গাছপালা, ফুল কী, হাওয়া। উজ্জ্বল

আলোয় ভরা মধ্য বসন্তের আকাশ। ও বাগানের দোলনায় দোল খাচ্ছে। হাস্যোজ্জ্বল মা'র মুখ। ওর দোলনা ঠেলে দিচ্ছে। ও উঁচুতে উঠে যাচ্ছে নেমে আসছে। ছোটবেলার একটা আলোকোজ্জ্বল দিন ও যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। একজন পরিচারিকা কী নাম যেন, ওর মাকে এসে ডাকলো। ওর মা চ'লে গেল। পরিচারিকাটি দোলনা ঠেলে দিতে লাগল। ফ্রান্সিস চ্যাঁচাচ্ছে 'আরো উঁচুতে ঠেল, আরো উঁচুতে'। পরিচারিকাটি ভীতস্বরে বলছে 'না, কর্তামা বকবে। তবু সে বেশ জোরেই ঠেলতে লাগল। ফ্রান্সিসের চোখের সামনে আকাশ, সাদাটে মেঘ, ঘরবাড়ি, গাছ-বাগান সব দুলছে। গায়ে হাওয়া লাগছে। ও খুশীতে চিৎকার করছে। হঠাৎ ছবিটার উজ্জ্বলতা কমতে লাগল। আস্তে-আস্তে অন্ধকার হয়ে গেল চারিদিক। মাথাটা যেন যন্ত্রণায় ছিঁড়ে পড়ছে।

কয়েদ ঘরের লোহার দরজা খোলার শব্দ হলো। বেন্‌জামিন কী যেন একটা জিনিস লুকিয়ে নিয়ে আসছে। ও চুপিচুপি এসে ফ্রেদারিকোর হাতে একটা চিনেমাটির ছোট বোয়াম দিয়ে ফিস্‌ফিস্‌ ক'রে বললো—'এটা ওর পিঠে আস্তে-আস্তে লাগিয়ে দাও, তুমিও লাগাও, সব সেরে যাবে। পরে ওটা নিয়ে যাবো। সাবধান, কেউ যেন না দেখে ফ্যালে।' বলে কাঠের পাঠাতনে কোন শব্দ না তুলে বেন্‌জামিন চ'লে গেলো।

হ্যারি বোয়ামটা ফ্রেদারিকোর হাত থেকে নিলো। তারপর আস্তে-আস্তে ফ্রান্সিসের পিঠে লাগিয়ে দিতে লাগলো। লাল আঠা-আঠা ওষুধটা। ওটা লাগাতেই ফ্রান্সিসের শরীর কেঁপে উঠলো। হ্যারি সাবধানে আলতো হাতে লাগাতে লাগলো। কেটে যাওয়া কালসিটে পড়া জায়গায় লাগানো শেষ হলো। কে জানে এটা কী ওষুধ? সারবে কিনা? এবার ফ্রেদারিকোর দিকে ফিরলো। ওর শতছিন্ন জামাটা সরিয়ে ওষুধটা লাগিয়ে দিল আস্তে-আস্তে। ফ্রেদারিকো অস্পষ্ট স্বরে গোঙাতে-গোঙাতে বোধহয় ঘুমিয়ে পড়লো। রাত বাড়তে লাগলো। আস্তে-আস্তে সবাই ঘুমিয়ে পড়তে লাগলো। শুধু হ্যারির চোখে ঘুম নেই। হাতকড়া বাঁধা হাতটা দিয়ে মাঝে-মাঝেই ফ্রান্সিসের কপালের উত্তাপটা দেখছে।

রাত গভীর হতে বেনজামিন পা টিপে-টিপে এলো। ওষুধের বোয়ামটা নিয়ে চ'লে গেল খুব সাবধানে। দু'জন প্রহরীর দৃষ্টি এড়িয়ে।

শেষ রাত্রির দিকে হ্যারির একটু তন্দ্রামত এসেছিল। ফ্রান্সিস বোধহয় পাশ ফিরে শুলো, তাই শেকলে শব্দ উঠলো। হ্যারির তন্দ্রা ভেঙে গেল। ও তাড়াতাড়ি ওর কড়া লাগানো হাতটা ফ্রান্সিসের কপালে রাখল। দেখলো, কপাল ঠাণ্ডা। বোধহয় জ্বর একেবারে ছেড়ে গেছে। ফ্রান্সিস অস্ফুটস্বরে হ্যারিকে ডাকতেই হ্যারি মুখ নীচু ক'রে ওর দিকে তাকিয়ে বলল—'কি?'

ফ্রান্সিস বললো—'শরীরটা খুব দুর্বল লাগছে।'

'ও কিছু না—কয়েকদিন বিশ্রাম নিলেই ঠিক হ'য়ে যাবে'—হ্যারি বলল।

তারপর কড়া লাগানো হাতটা দিয়ে ফ্রান্সিসের কপালে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। ফ্রান্সিস আবার ঘুমিয়ে পড়লো। হ্যারি আর ঘুমোল না। ফ্রান্সিসের কপালে-মাথায় হাত বুলোতে লাগলো।

সকাল হ'য়ে গেছে। সকলেই উঠে বসেছে। শুধু ফ্রান্সিস আধশোয়া হ'য়ে। শরীরের দুর্বলতাটা এখনও সম্পূর্ণ কাটে নি। ওদের সকালের বরাদ্দ খাবার আলুসেদ্ধ

আর কফিপাতা মেশানো সুপ। সকলেই খাচ্ছে। ফ্রেদারিকো তখন হ্যারিকে জিজ্ঞেস করলো, 'তোমার বন্ধু কেমন আছে ?'

—মনে হচ্ছে জ্বরটা ছেড়েছে। তবে শরীরটা এখনও দুর্বল আছে।

—বন্ধুর নাম কি ?

—ফ্রান্সিস।

ঠিক এই সময়ে বেনজামিন খাবারের থালা নিয়ে এলো। ফ্রেদারিকো ইশারায় ওকে ডাকলো। কাছে আসতে মুখ বাড়িয়ে ফিসফিস ক'রে বললো 'ঐ যে ছেলেটি ফ্রান্সিস, ওকে আমার সঙ্গে রাখো।' বেন্‌জামিন সাবধানে চারদিকে তাকিয়ে দেখে নিলো। তখন আর দু'জন প্রহরী খেতে গেছে। বেন্‌জামিন চাবি বের করে ফ্রান্সিসের কাছে এসে ওর হাতের কড়া খুলে দিল। তারপর বললো—'তুমি ফ্রেদারিকোর পাশে থাকবে। এসো।'

ফ্রান্সিস আস্তে-আস্তে উঠে ফ্রেদারিকোর পাশে বসলো। ওখানে ওর হাতকড়া আটকে দিয়ে বেনজামিন চলে গেল। এবার হ্যারি আর ফ্রান্সিস ফ্রেদারিকোর পাশেই জায়গা পেল। ফ্রান্সিসও এটাই চাইছিল। কিন্তু বেন্‌জামিন তো কথা শুনবে না তাই ও কোনকথা বলেনি। ফ্রান্সিস এটাই চাইছিল কারণ, ফ্রেদারিকোকে লা ব্রুশ মুক্তোর সমুদ্রের কথা জিজ্ঞেস করেছে। মুক্তোর সমুদ্র কী ? কোথায় আছে এই মুক্তোর সমুদ্র ? কথাটা শুনে পর্যন্ত ফ্রান্সিসের মনে তোলপাড় চলছে। ফ্রেদারিকোর পাশে বসতেই ফ্রেদারিকো ওর মুখের দিকে তাকিয়ে হাসল—'তুমি আমাকে চাবুকের মার থেকে বাঁচিয়েছো ফ্রান্সিস, তোমার ঋণ আমি জীবনেও শোধ করতে পারবো না।'

—'পারবে !' ফ্রান্সিস ক্লান্ত হাসি হেসে বলল।

—কি ক'রে।

—যদি বলো মুক্তোর সমুদ্র ব্যাপারটা কি ?

কথাটা শুনে ফ্রেদারিকোর মুখে ভয়ের ছায়া পড়ল। ভীতমুখে ও বললো, না-না—মুক্তোর সমুদ্রের কথা ভুলে যাও—ওখানে গেলে কেউ ফেরে না।

ফ্রান্সিস হাসল। 'তুমি বলো তো মুক্তোর সমুদ্র ব্যাপারটা কি ?'

—'তুমি ওখানে যেতে চাও' ? ফ্রেদারিকো অবাক চোখে তাকাল।

—আগে শুনি তো।

—গেলেও ফিরে আসতে পারবে না।

—ঠিক আছে, ধ'রে নাও না আমার কৌতুহল হ'য়েছে।

ফ্রেদারিকো মুখ নীচু ক'রে কী ভাবলো। তারপর বলল—'দেখো লা ব্রুশকে আমি সবই বলেছি, কিন্তু মুক্তোর সমুদ্র থেকে অক্ষত দেহে বেরিয়ে আসবার ব্যাপারটা আজও আমার কাছে রহস্য থেকে গেল। কিন্তু লা ব্রুশের বিশ্বাস যে আমি সেটাও জানি। অথচ ঐ রহস্যটা যে ভেদ করা অসম্ভব, সেটা আমি ওকে বোঝাতে পারি নি।'

'ঠিক আছে'—ফ্রান্সিস উঠে বসে বলল—'তুমি যা জানো, বলো।'

একটু থেমে ফ্রেদারিকো বলতে লাগলো—'কত বছর আগেকার কথা আমি বলতে পারবো না। কারণ এখানকার এই নরকে দিন রাত্রির কোন পার্থক্য নেই। আমি প্রথম-প্রথম দিনরাত্রের হিসাবের বহু চেষ্টা করেছি। পরে হাল ছেড়ে দিয়েছি।'

ফ্রেদারিকো থেমে তার কোমরের গাঁট থেকে তামাকপাতা বের ক'রে মুখে ফেলে চিবুতে-চিবুতে বলতে লাগল—'একবার চাঁদের দ্বীপের কাছাকাছি আমাদের জাহাজ এসেছিল। আমাদের জাহাজটা ছিলো মালবাহী জাহাজ। গায়েরও জোর ছিল, খাটতেও পারতাম খুব। ক্যাপ্টেন আমাকে খুব ভালোবাসতো। সেই প্রথম আমরা চাঁদের দ্বীপে যাচ্ছি।'

—চাঁদের দ্বীপ কোথায়?

—আফ্রিকার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে ডাইনী দ্বীপ, তারও দক্ষিণে।

—লা ব্রুশ যে সেদিন বলেছিল এই ক্যারাভাল ডাইনী দ্বীপে যাবে।

—তা-তো যাবেই। লা ব্রুশ ওর সমস্ত লুঠের সম্পদ ঐ দ্বীপেই রাখে। তারপরেই ও যাবে চাঁদের দ্বীপে।

—ও। তারপর?

—চাঁদের দ্বীপের বন্দরটার নাম 'সোফালা'। এই দ্বীপের অধিবাসীদের বলা হয় 'ভাজিম্বা'। হলদে চামড়া, বেঁটেখাটো মানুষ এরা। সোফালা বন্দর থেকে প্রচুর তামাক আর মধু রপ্তানি হয়। আমাদের জাহাজ থেকে চিনি, ময়দা, কাপড়-চোপড় এসবের বদলে তামাক পাতা, মধু নেওয়া হলো। এসব বাণিজ্যের জন্য ভাজিম্বাদের রাজার অনুমতি নিতে হয়। রাজপ্রাসাদে গিয়ে রাজসভায় রাজার অনুমতি প্রার্থনা করতে হয়—এই রীতি। কিন্তু এই চাঁদের দ্বীপের খ্যাতি অন্য কারণে। সেটা হলো এখানকার 'মুক্তোর সমুদ্র'। এই অঞ্চল দিয়ে যে সব জাহাজ যায়, সেইসব জাহাজের লোকরা সকলেই এই মুক্তোর সমুদ্রের গল্প শোনে। কিন্তু কেউ জানে না সেই মুক্তোর সমুদ্র কোথায়। তবে এটা সবাই জানতে পারে, যে সেখানে গেলে কেউ ফিরে আসে না। পরে সেই মুক্তোর সমুদ্র আমি দেখেছিলাম। আসলে ওটা একটা ল্যাগুন। ভাজিম্বারাও বলে মুক্তোর সমুদ্র। মস্তবড় ঝিনুক-এর তলায় বড়-বড় মুক্তো। হাঁসের ডিম থেকে শুরু ক'রে উটপাখির ডিমের মতো বড় সেই মুক্তো।'

—'বলো কি?' ফ্রান্সিস আশ্চর্য হ'য়ে বললো। হ্যারিও কম অবাক হয় নি। বলে কি? এত বড়ো মুক্তো।

—সেই মুক্তোর সমুদ্র কী ঐ দ্বীপের মধ্যেই?

—'হ্যাঁ' বলে ফ্রেদারিকো চুপ ক'রে গেল। আর কোনো কথা না বলে চোখ বুঁজে তামাক পাতা চিবুতে লাগল। ফ্রান্সিস হ্যারি দু'জনেই অধীর হ'য়ে উঠলো। ফ্রান্সিস ব'লে উঠলো—'তারপর'?

ফ্রেদারিকো সেই চোখ বুঁজে তামাকপাতা চিবুতে লাগল। হ্যারি ওকে মৃদু ঝাঁকুনি দিল—'ফ্রেদারিকো, কি হলো'?

ফ্রেদারিকো পাতা চিবুনো বন্ধ ক'রে চোখ মেলে সেই ফ্যাসফেসে গলায় বললো—'এই জোয়ান বয়েসে তোমার জীবন শেষ হয়ে যাক, এটা আমি চাই না।'

'—সেটা আমরা বুঝবো। তুমি বলো।' ফ্রান্সিস অধৈর্য হ'য়ে বলল। কিন্তু ফ্রেদারিকো সেই যে চুপ করলো আর একটি কথাও বললো না। ফ্রান্সিস আর হ্যারি অনেক ভাবে কথা বলাবার চেষ্টা করল, কিন্তু ফ্রেদারিকো মুখে একেবারে কুলুপ এঁটে দিল। সেই চোখ বুঁজে তামাক পাতা চিবুতে লাগল। শেষে ফ্রান্সিস আর হ্যারি হাল ছাড়লো।

এরমধ্যে ফ্রান্সিস সুস্থ হলো। বেনজামিনের ওষুধে খুব উপকার হতে কয়েকদিনের মধ্যেই আবার ও আগের মতো গায়ে শক্তি ফিরে পেল।

* * *

দিন যায়। ক্যারাভেলও চলেছে। কোনদিকে কোথায় যাচ্ছে, ফ্রান্সিসরা কেউ জানে না। ওদের একঘেঁয়ে বন্দীজীবন কাটাতে লাগল। ফ্রান্সিস আর হ্যারি পালাবার কত ফন্দী বার করে, কিন্তু কোনটাই শেষ পর্যন্ত কার্যকরী করা যাবে বলে মনে হয় না। ওরা হাল ছেড়ে দিয়ে সুযোগের অপেক্ষায় থাকে।

এদিকে ফ্রেদারিকোও আর মুক্তোর সমুদ্রের গল্প করে না। ঐ প্রসঙ্গ তুললেই ও চুপ ক'রে যায়। চোখ বুঁজে তামাকপাতা চিবোয়। কখনও বা গলায় লকেটের মতো ঝোলানো ভাঙা আয়নাটায় মুখ দেখে, চোখ বড়-বড় ক'রে নাক কুঁচকে ভেংচি কাটে। অন্য অনেক কথা বলে—ওর অতীত জীবনে জিপসিদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াবার গল্প বা জাহাজী জীবনের গল্প সব বলে। কিন্তু মুক্তোর সমুদ্রের কথা উঠলেই চুপ করে থাকে।

এক দিন। সকালই হবে তখন। হঠাৎ ক্যারাভেলটা যেন থেমে আছে মনে হলো। জলদস্যুদের হাঁক-ডাক শোনা গেল। নোঙর ফেলবার ঘড়্-ঘড়্ শব্দ ভেসে এসো। সেই সঙ্গে পাখির কিচির-মিচির ডাক। নিশ্চয়ই কোন স্থলভুমিতে ক্যারাভেল লেগেছে। ফ্রান্সিসের মনটা খারাপ হ'য়ে গেল—আঃ কতদিন মাটি দেখিনা গাছপালা দেখিনা—পাখি-পাখালির ডাক শুনি না, আকাশ দেখি না। ফ্রান্সিস একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। বাড়ির কথা মনে পড়লো। মা'র কথা। সবার কথা। ছোট ভাইটা এখন না জানি কত বড় হয়েছে। আর কি ওদের দেখতে পাবো ? কোনদিন কি আর মাটি-আকাশ দেখতে পাবো ? ফ্রান্সিস হঠাৎ মাথায় একটা ঝাঁকুনি দিয়ে উঠে বসলো। এসব চিন্তাকে প্রশ্রয় দেওয়া চলে না। তাহলে শরীর মন ভেঙে যাবে। তা কখনই হতে দেওয়া চলবে না। এই বন্দী জীবন থেকে যে ক'রে হোক পালাতে হবে। এবার যেতে হবে মুক্তোর সমুদ্রে। উট পাখীর ডিমের মত মুক্তো। আঃ কল্পনাই করা যায় না। এখম শুধু ফ্রেদারিকোর কাছ থেকে মুক্তোর সমুদ্রের খোঁজটা নেওয়া। তারপর এখান থেকে পালানো। পালাতেই হবে। যে ক'রে হোক।

একটু পরেই বেনজামিন আর দু'জন প্রহরী সকালের খাবার নিয়ে এল। সকলে খাচ্ছে, তখনই বেনজামিন বলল—'খাওয়ার পরে তোমাদের মধ্যে থেকে চারজন এসো। ক্যাপ্টেন লা ব্রুশ তলব করেছে। সকলেই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলো কি ব্যাপার ! হঠাৎ জরুরী তলব ? খাওয়া শেষ ক'রে কয়েকজন ফ্রান্সিসের দিকে স'রে এলো। ফ্রান্সিস বুঝে উঠতে পারল না, কী বলবে ? যখন ডেকেছে, যেতেই হবে। না গেলে অগ্নিমূর্তি ধারণ করবে লা ব্রুশ। বলা যায় না হয়ত চাবুক হাতে ছুটে আসবে। তখন মুখ বুঁজে মার খাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। ফ্রান্সিস বেনজামিনকে জিজ্ঞাসা করলো 'কেন ডাকছে ?'

'—আমি জানি না। আমি হুকুমের চাকর।' বেনজামিন বললো।' ওর পাথরের মত মুখে কোন অভিব্যক্তি নেই। ফ্রান্সিস ভাইকিংদের দিকে তাকিয়ে বললো,—'ঠিক আছে যে কেউ চারজন যাও।' ভাইকিংরা উঠে দাঁড়ালো। বেনজামিন ওর কোমরে ঝোলানো চাবির গোছা থেকে চাবি নিয়ে চারজনের হাতকড়া খুলে দিলো। চারজন হাতের কব্জিতে

হাত বুলোতে-বুলোতে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হাসল। হয়তো কিছুক্ষণের জন্য তবু মুক্তি তো। বাইরের মাটি-আলো-বাতাসে যেতে পারবে বহুদূর, বিস্তৃত আকাশের নিচে গিয়ে দাঁড়াতে পারবে। কতদিন পর ছাড়া পেল, তা মা মেরীই জানে।'

বেনজামিন চারজনকে নিয়ে চলে গেল। এতক্ষণ ফ্রেদারিকো ঘুমিয়ে ছিল। আজকাল রাত্রে ওর ভালো ঘুম হয় না। ঘুম তাই ওর চোখে লেগেই থাকে। বেশ বেলা অব্দি ঘুমোয়। বেনজামিন ওর জন্যে বেলাতেই খাবার আনে। অন্যদের যে খাবার দেওয়া হয়, সে খাবারও দেয় না। কোনদিন কলা আধখানা, ডিম নয়তো বিস্কুট-পাঁউরুটির টুকরো। সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে বেনজামিন এসব খাবার এনে দেয়।

কিছুক্ষণ পরে বেনজামিন লুকিয়ে খাবার নিয়ে এল। ধাক্কা দিতে ফ্রেদারিকোর ঘুম ভাঙল। খাবার এগিয়ে দিল। চারজন ভাইকিংকে লা ব্রুশ ডেকে নিয়ে গেছে, এ খবর ও জানতো না। কথায়-কথায় হ্যারি সেকথা ওকে বলল। ফ্রেদারিকো ভীষণভাবে চমকে উঠল। ফ্যাস্‌ফেসে গলায় যতটা জোর দেওয়া সম্ভব, ততোটা জোর দিয়ে বলল—'করেছো কি? ওদের মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিলে?'

—'তার মানে?' হ্যারি তো অবাক। ফ্রান্সিসও এদের কথাবার্তা শুনে এগিয়ে এল। ফ্রেদারিকো বলল—'জানো, ওদের কেন নিয়ে গেল লা ব্রুশ?'

—'তা কি ক'রে বলবো।' হ্যারি বলল।

—'এই ক্যারাভেল জাহাজ ডাইনীর দ্বীপে এসে লেগেছে। লা ব্রুশ ওর লুট করা সম্পত্তি ধন ডাইনীর দ্বীপে কোথায় কোন গহবরে কোন গুহায় লুকিয়ে রাখবে। অত লুটের মাল ব'য়ে নিয়ে যেতে লোক দরকার, তাই ওদের নিয়ে গেছে।'

—'তবে আর ভয়ের কি আছে?' ফ্রান্সিস বলল।

—'হুঁ'—ফ্রেদারিকো খানিকক্ষণ ওদের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর বলল—'লা ব্রুশ ওদের দিয়ে লুটের মাল রেখে আসবে। ওরাও জায়গাটা দেখবে। এর পরেও কি লা ব্রুশ ওদের বাঁচিয়ে রাখবে?'

সত্যিই তো! এ কথাটা তো ওরা ভাবে নি। লা ব্রুশ তো ওদের ওখানেই মেরে ফেলবে। গুপ্তধন ভান্ডারের খোঁজ জানে, এমন কাউকেই বেঁচে থাকতে দেবে, এ অসম্ভব। ফ্রান্সিস লাফিয়ে উঠল। ওদের ফিরিয়ে আনতে হবে। কিন্তু কি ক'রে ফিরিয়ে আনব? ওরা চলে গেছে বেশ কিছুক্ষণ। এতক্ষণে বোধহয় ডাইনীর দ্বীপে পৌঁছেও গেছে।

ফ্রান্সিস চিৎকার করে ডাকল— 'বেনজামিন—বেনজামিন।'

বেনজামিন দরজার কাছে গারদ ধ'রে দাঁড়াল।

—লা ব্রুশ কোথায়?

—বলা বারণ।

—আমাদের চারজন লোক?

—বলা বারণ।

—লা ব্রুশকে বলো আমরা তার সঙ্গে কথা বলতে চাই।

—এখন দেখা হবে না।

—'এক্ষুনি ক্যাপ্টেনকে ডাকো।' ফ্রান্সিস ক্রুদ্ধস্বরে চিৎকার করে উঠল। সঙ্গে-সঙ্গে

অন্য ভাইকিংরা লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। ওদের চারজন বন্ধুর বিপদের আশঙ্কা ওদেরও ভীষণভাবে বিচলিত করল! লোহার শেকলে হাতকড়ায় ঝনঝন শব্দ উঠল।

বেনজামিন ভাবলেশহীন চোখে তাকিয়ে দেখে তারপর চ'লে গেল। ফ্রান্সিস চিৎকার ক'রে ডাকল—'বেনজামিন।'

কিন্তু বেনজামিন ফিরল না। অন্য দু'জন পাহারাদার দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। কোমর থেকে তরোয়াল খুলে দরজায় পাহারা দিতে লাগল।

রাগে-দুঃখে নিজেদের অসহায় অবস্থার কথা ভেবে ফ্রান্সিসের চোখে জল এল। ও যদি বিন্দুমাত্র আঁচ করতে পারতো, যে ওর বন্ধুদের সাংঘাতিক বিপদ হ'তে পারে, তা'হলে নিশ্চয়ই রুখে দাঁড়াত। কিন্তু এখন আর কিছু করার নেই। সর্বনাশ যা হবার হ'য়ে গেছে। ওই বন্ধু চারজন আর কোনদিন ফিরবে না। ওর ক্রুদ্ধ চোখ-মুখ থেকে আগুন ঝরতে লাগল। পাগলের মত হাতের কড়াটা কাঠের মেঝেয় ঠুকতে লাগল। কব্জীর চামড়া ফেটে রক্ত ঝরতে লাগল। হ্যারি ওকে শান্ত করবার চেষ্টা করতে লাগল। বার-বার বলতে লাগল—'ফ্রান্সিস শান্ত হও। মাথা ঠিক রাখো।'

ফ্রান্সিস তবুও মাথা ঝাঁকিয়ে মেঝেতে হাতের কড়াটা জোরে-জোরে ঠুকে চললো। তারপর এক সময় ক্লান্ত হ'য়ে রক্তাক্ত হাত দুটো ওপরের দিকে তুলে ফোঁপাতে লাগল।

* * *

ওদিকে—সেই চারজন ভাইকিং কয়েদঘর থেকে বেরিয়ে যখন ডেক-এ উঠলো—সকালের ঝক্‌ঝকে উজ্জ্বল রোদে ভালো করে তাকাতেই পারল না। চোখে হাত চাপা দিয়ে চলল। ক্যারাভেল-এর মাথার কাছে এসে দেখল একটা মোটা কাছি ঝুলছে। নীচে জলের ওপর একটা ছোট নৌকা। নৌকার মাঝখানে একটা পেতলের কারুকাজ করা লোহার বড় সিন্দুকের মত বাক্স। একটু দূরেই ভাইনির দ্বীপ, দূরবিস্তৃত বালিয়াড়ি। নারকোল গাছের সারি। তারপর সবুজ গাছ-গাছালি ঢাকা পাহাড়। কতদিন পরে মাটি-গাছপালা-আকাশ দেখছে। ওদের আনন্দ ধরে না। বেন্‌জামিনের নির্দেশে ওরা কাছি বেয়ে-বেয়ে নেমে এল। একটু পরেই ডেক-এর ওপর খট্‌ খট্‌ শব্দ তুলে লা ব্রুশ এল। জলদস্যুরা সবাই সন্ত্রস্ত। জাহাজের মাথার কাছে একটা দড়ির জালমতো ঝুলছিল। লা ব্রুশকে সকলে ধরাধরি করে সেই জালের মধ্যে বসিয়ে দিল। আস্তে-আস্তে জালটা দড়ি দিয়ে নামাতে লাগল, লা ব্রুশ নৌকোর ওপর আসতেই জাল নামানো বন্ধ হলো। লা ব্রুশ কাঠের পা বের করে জাল থেকে ঠক্‌ ক'রে নৌকোর ওপর নামল। ভাইকিং চারজন দেখল লা ব্রুশের কোমরে তরোয়ালের সঙ্গে নক্সা আঁকা মিনে করা একটা লম্বা নল অলা পিস্তল গোঁজা। লা ব্রুশ নৌকায় বসেই দ্বীপের দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে হুকুম দিল—চল।

চারজনে দাঁড় বাইতে লাগল। এতক্ষণে ওদের চোখে আলো সহ্য হ'য়ে গেছে। ওরা বেশ জোরে-জোরেই দাঁড় বাইতে লাগল। এখানে সমুদ্র শান্ত। ঢেউয়ের খুব ধাক্কা নেই। ওরা কিছুক্ষণের মধ্যেই দ্বীপে পৌঁছল। দ্বীপের বালিয়াড়িতে প্রথম নামল লা ব্রুশ। পেছন ফিরে বলল—'ঐ সিন্দুকটা নিয়ে আমার পেছনে-পেছনে তোরা আয়।'

—'কোথায়'? একজন ভাইকিং জিজ্ঞাসা করল।

—'চল না সব দেখবি'—লা ব্রুশ খুক-খুক্‌ ক'রে হেসে বললো।

ওরা ধরাধরি করে সিন্দুকটা নামাল। তারপর ধরে-ধরে বয়ে নিয়ে চলল লা ব্রুশের পেছনে-পেছনে।

একটু পরেই শুরু হ'ল পাহাড় এলাকা, রাস্তা বলে কিছুই নেই, এবড়ো-খেবড়ো পাথর-নুড়ি, বুনো ঝোপ-জঙ্গল ঠেলে এগোতে হচ্ছে। লা ব্রুশ আগে-আগে চলেছে। তরোয়াল চালিয়ে ঝোপ-জঙ্গল কেটে এগোছে। পেছনে ওরা চারজন! অসম্ভব ভারী বাক্স। তারপর ওরকম উঁচু-নীচু রাস্তা। ওরা ঘেমে উঠল। লা ব্রুশ এক একবার থামছে, আর পেছন ফিরে দেখে নিচ্ছে। এতক্ষণে ওরা লক্ষ্য করলো যে মাথার ওপর গাছের ডালপালা থেকে কী যেন ওদের গায়ে পড়ছে। মাটিতে খালি পা কিসে লেগে খুড়-খুড় করছে। একজন ভালো করে দেখল—জোঁক পা কামড়ে ধরেছে। গাছের ডাল থেকে গায়ে পড়ছে জোঁক। লা ব্রুশের পরনে লম্বা কোট, এক পায়ে বুটজুতো আর এক পা তো কাঠের। ওর কোন সমস্যা নেই। কিন্তু ভাইকিংরা ভীত হয়ে পড়ল। এত জোঁক্?

ওরা তাড়াতাড়ি বাক্স নামিয়ে জোঁক ছাড়াতে লাগল। লা ব্রুশ ঘুরে দাঁড়িয়ে তরোয়াল ওঁচাল—'জলদি চল্'।

ওরা আর কি করে! তবু একজন ভাইকিং বলে উঠল, 'জোঁকে খেয়ে ফেলছে—হাঁটবো কি করে। লা ব্রুশ খুক্ খুক্ করে হাসল—'অনেকদিন মানুষের রক্ত খায় নি তো। চল্। গুহায় পৌছে নুন দিয়ে দেবো। চল্ জলদি।'

আবার চলা শুরু হলো। তখন ওদের গায়ে হাতে-পায়ে জোঁক আছে। একটা খাড়াইয়ের ওপর এসে পেঁাছল ওরা। ওপর থেকে ঝর্নার জল পড়ছে। জায়গাটা ভেজা-ভেজা। অনেক ফার্ণ গাছ। পাথরে সবজে শ্যাওলার আস্তরণ।

লা ব্রুশ হাত তুলে ওদের থামতে ইঙ্গিত করল। ওরা বাক্সটা নামিয়ে হাঁপাতে লাগল। গায়ে লেগে থাকা জোঁক্ টেনে তুলতে লাগল। একজন লা ব্রুশকে বলল—'কই নুন দিন'?

লা ব্রুশ কোমরে বেল্টের মধ্যে থেকে একটা পুটুলি বের করল। পুটুলি থেকে ওদের হাতে নুন ঢেলে দিলে। নুন লাগাতেই জোঁকগুলো টুপ-টুপ করে খসে পড়ল। লা ব্রুশ ও নিজের গায়ের দু' এক জায়গায় নুন লাগাল। জোঁকগুলো খসে পড়ল।

লা ব্রুশ এবার শ্যাওলার আস্তরণে ঢাকা একটা মস্তবড় পাথরের চাঁই ধ'রে টানল। পাথরটা বেশ কিছুটা সরে গেল। ফাটল দেখা গেল। লা ব্রুশ ওদের দিকে ফিরে তাকিয়ে সরে এসে বলল—'এই পাথরের চাঁইটা ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দে।'

ওরা চারজনে মিলে পাথরটা টান দিয়ে সরাতে ফাঁকটা আরো বড় হল।

'আরো খুলতে হবে'—লা ব্রুশ বলল।

আবার ওরা ধাক্কাধাক্কি শুরু করল। একজন মানুষ ঢোকবার মত ফাঁক হল। আবার কয়েকটা ধাক্কায় বাক্স গলে যাবার মতো ফাঁক হলে লা ব্রুশ বলল—'এবার শুধু দু'জনকে বাক্সটা ভেতরে নিয়ে গিয়ে রাখতে হবে।' ভাইকিংদের মধ্যে দু'জন এগিয়ে এল। বেশ কষ্ট করে দু'জন ফাটলটার মধ্যে দিয়ে বাক্সটা নিয়ে ভেতরে ঢুকল। দেখল, ভেতরটা একটা গুহা, অন্ধকার। শুধু পাথরের চাঁইয়ের ফাটলটার মধ্যে দিয়ে একটু আলো আসছে। চোখে অন্ধকার সরে যেতে ওরা দেখল, ভেতরে বেশ কয়েকটা একইরকম লোহার বাক্স। পেতল দিয়ে নক্সা করা। ওরা বুঝল, এটাই হচ্ছে লা ব্রুশের গুপ্ত ধনভাণ্ডার। হঠাৎ

ওরা পায়ে হোঁচট খেল। ভালো করে তাকিয়ে দেখল কয়েকটা নরকঙ্কাল। হয়তো আরো নরকঙ্কাল আছে, কিন্তু এই আলোতে দেখা যাচ্ছে না। এইবার ওরা ভীত হলো, পরস্পরের হাত ধরল। লা ব্রুশের এই গুপ্ত ধনভাণ্ডারের খোঁজ জানার পর লা ব্রুশ কি ওদের বেঁচে থাকতে দেবে? একজন চেঁচিয়ে উঠল—শীগগির পালাও। দু'জনে পাথরের ফাটলের দিকে ছুটল। ঠিক তখনই সেই ফাটলের মুখে এসে দাঁড়াল লা ব্রুশ। হাতে উদ্যত রিভলবার, ওরা কিছু বোঝবার আগেই লা ব্রুশ গুলি চালাল। নিখুঁত নিশানা। দু'টো গুলিই ওদের হৃৎপিণ্ড ভেদ করল। একজন তবু মাটিতে পড়ে আঁ-আঁ করে দু' একবার কাতরাল। অন্যজন মাটিতে পড়ে আর নড়ল না।

বাইরে যে দু'জন 'ভাইকিং' দাঁড়িয়েছিল, তাদের একজনের নাম 'বিস্কো'। লা ব্রুশ পিস্তল হাতে ওদের দু'জনের দিকে ঘুরে দাঁড়াতেই বিস্কো চেঁচিয়ে উঠল 'পালাও।' বিস্কো চিৎকার করে উঠেই খাড়াই থেকে একটা গাছ লক্ষ্য করে ঝাঁপ দিল। গাছটার মগডাল ধরে ঝুলে পড়ল। ডালটা ভেঙে গেল কিন্তু খুলে এলো না। ও প্রথম ধাক্কাটা সামলালো। তারপর ডাল বেয়ে নেমে আসতে লাগল। এত দ্রুত বিস্কো ঝাঁপ দিয়েছিল, যে লা ব্রুশ পিস্তল নিশানা করবার অবকাশ পেল না, অন্যজনও সঙ্গে-সঙ্গে নীচের দিকে ছুটল। কিন্তু শেষরক্ষা হল না। লা ব্রুশের নিখুঁত নিশানার গুলি ওর পিঠ ভেদ করে ঢুকে পড়ল। ও খাড়াই পাহাড়ের গায়ে কয়েকটা পাক খেয়ে নীচে গাছ-গাছালির আর ঝোপের মধ্যে গড়িয়ে পড়ল। যে গাছটায় বিস্কো লাফিয়ে পড়েছিল—সেই গাছটা লক্ষ্য করে লা ব্রুশ পিস্তল থেকে দু'টো গুলি ছুঁড়লো। কিন্তু কোনটাই বিস্কোর গায়ে লাগল না। কারণ, বিস্কো ততক্ষণে অন্য একটা ঝোপে আত্মগোপন করেছে।

লা ব্রুশ পিস্তলটা কোমরে গুঁজতে-গুঁজতে আপনমনেই খুক্-খুক্ করে হেসে উঠল। তারপর ঠক্-ঠক্ করে এগিয়ে গিয়ে দু'হাতে ফাটলের পাথরটায় ধাক্কা দিল। প্রাণপণে বার-কয়েক ধাক্কা দিতেই পাথরটা আগের মত লেগে গেল। সবুজ শ্যাওলায় ঢাকা পাথরের গায়ে ফাটলটা কোথায়, সেটা আর বোঝবার উপায় রইল না।

এবার লা ব্রুশ কাঠের পায়ে ঠক্-ঠক্ শব্দ তুলে নেমে আসতে লাগল। ঝোপ-জঙ্গল ঠেলে আসতে লাগল। গাছের পাতা থেকে বেশ কয়েকটা জোঁক্ পড়ল। গায়ে-পায়ে লেগেও রইল কয়েকটা। সমুদ্রের তীরে এসে নুন ছিটিয়ে জোঁকগুলো ফেলে দিল। তারপর কাঠের পাঠায় ভর দিয়ে নৌকায় উঠে বসল। নৌকা ছেড়ে দিয়ে দাঁড় বাইতে লাগল।

* * *

এদিকে ফ্রান্সিসরা প্রথম দু'টো গুলির শব্দ অস্পষ্ট শুনেছিল। কিন্তু পরের গুলির শব্দগুলো স্পষ্টই শুনলো। ওদের মধ্যে গুঞ্জন উঠল। দু'একজন ফ্রান্সিসকে ডেকে বলল 'ফ্রান্সিস—নিশ্চয়ই বিস্কোরা কোন বিপদে পড়েছে। তুমি কিছু একটা করো।'

ফ্রান্সিস মুখ নীচু করে গভীর বিষাদে মাথা নাড়ল—'কিছুই করার নেই। এই অন্ধকূপ থেকে বেরোতে না পারলে আমরা অসহায়। এখন সবরকম অন্যায়-অবিচার মুখ বুজে সহ্য-করে যেতে হবে। কোন উপায় নেই।'

কথা বলতে-বলতে ফ্রান্সিসের মুখ ক্রোধে আরক্ত হয়ে উঠল। দু'চোখ জ্বালা করে জলে ভরে উঠল। ভাইকিং বন্ধুরা কিন্তু অধৈর্য হয়ে উঠল। পরস্পর এই নিয়ে কথা



বলতে-বলতে সবাই উঠে দাঁড়াতেই হাতের কড়ায় শেকলে শব্দ উঠল। ওরা একসঙ্গে প্রচণ্ড জোরে চিৎকার করে উঠল—'হো—হো—ও—ও।'

বেনজামিন ছুটে এসে দরজার গরাদের ওপাশে দাঁড়াল। ওদের মধ্যে দু'-একজন চীৎকার করে বলল—'আমাদের বন্ধুরা কোথায় ?'

—'আমি কিছু জানি না।' বেন্‌জামিন নির্বিকার মনে জবাব দিল।

—'তুমি ওদের নিয়ে গেলে কেন' ? একজন জিজ্ঞেস করল।

—ক্যাপ্টেনের হুকুমে।

—ক্যাপ্টেন ওদের কোথায় নিয়ে গেছে ?

—'বলা বারণ'। বেন্‌জামিনের মুখ পাথরের মত শক্ত-ভাবলেশহীন।

—'তোকে খুন করবো—একজন চেঁচিয়ে উঠল। সঙ্গে-সঙ্গে সকলে চিৎকার করে উঠল—'হো—ও—ও'। সবাই শেকল ধরে টানতে লাগল। কিন্তু অত্যন্ত শক্ত ভাবে কাঠের কাঠামোতে গাঁথা শেকলের ঝন্‌-ঝন্‌ শব্দই শুধু হলো। ঐ শেকল ছেঁড়া অসম্ভব। ওরা আবার একসঙ্গে চিৎকার করে উঠল—'হো—ও—ও'। ঠিক তখনই ঐ গণ্ডগোলের মধ্যে ফ্রান্সিস অস্পষ্ট ঠক্‌ ঠক্‌ শব্দ শুনল। ফ্রান্সিস দ্রুত উঠে দাঁড়াল। কড়ায় বাধা দু'হাত তুলে বলল—'ভাইসব—শান্ত হও, খুব সম্ভব লা ব্রুশ আসছে'।

একটু পরেই পাহারাদার দু'জন সশস্ত্র হয়ে দাঁড়াল। বেন্‌জামিন এগিয়ে এসে দরজা খুলতে লাগল। দরজা খোলা হল। লা ব্রুশ ঠক্‌-ঠক্‌ শব্দ তুলে এগিয়ে এসে ভাইকিংদের জটলার দিকে তাকিয়ে গলা বাড়িয়ে বলল—'এত চেঁচামেচি কিসের ?'

ফ্রান্সিস এতক্ষণ মাথা নীচু করে চুপচাপ বসেছিল। এইবার উঠে দাঁড়াল। তখন গোলমাল থেমে গেল। ফ্রান্সিস বলল—'আমাদের বন্ধুরা কোথায় ?'

লা ব্রুশ ওর দিকে ঘুরে তাকিয়ে খুব সহজ ভঙ্গীতে বলল—'দু'জন আমার গুপ্ত-ভাণ্ডারে পাহারা দিচ্ছে। একজন পালাতে গিয়ে মারা গেছে।'

—অতগুলো গুলীর শব্দ পেলাম কেন ?

লা ব্রুশের ক্রুদ্ধ চোখ-মুখ নরম হ'য়ে এল। খুক্‌-খুক্‌ করে হেসে উঠল। বলল—'ও এই ব্যাপার ? আরে দু'টো ডোডো পাখি মেরেছি—রাত্তিরে রোষ্ট খাবো। তোফা মাংস'।

—আপনার গুপ্তভাণ্ডার কোথায় ?

'—বলবো না'—লা ব্রুশ ক্রুদ্ধভঙ্গীতে চীৎকার করে উঠল।

—'আমাকে বলতেই হবে'। ফ্রান্সিস দাঁত চাপাস্বরে বলে উঠল—'বলতে হবে আপনাকে ওদের দু'জনকে কোথায় রেখে এসেছেন' ?

একটু থেমে লা ব্রুশ বলল—'ডাইনির দ্বীপে যাও, খুঁজে বের কর গে।'

'—আপনার গুপ্তভাণ্ডারের ওপর আমাদের বিন্দুমাত্র লোভ নেই, কিন্তু ঐ দু'জনকে এক্ষুনি ফিরিয়ে আনতে হবে—' ফ্রান্সিস বলল।

ক্রুদ্ধকণ্ঠে লা ব্রুশ বলে উঠল—'অনেক সহ্য করেছি, আর একটি কথা বলবে তো—' বলে লা ব্রুশ কোমরের বেলটে গোঁজা পিস্তলটা বার করে ফ্রান্সিসের বুকের দিকে নিশানা করে স্থির দৃষ্টিতে ফ্রান্সিসের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। ফ্রান্সিস তিক্ত হাসি হাসল। বলল, 'লা ব্রুশ তুমি একটা জঘন্য নরঘাতক খুনে। কিন্তু তোমার কুবুদ্ধি কিছু কম না।

তুমি কিছুতেই এখন আমাদের মারবে না। বাঁচিয়ে রাখবে। য়ুরোপের ক্রীতদাসের বাজারে আমাদের জন্যে ভালো দাম পাবে এই আশায়'। লা ব্রুশ এক মুহূর্ত কি ভাবল। পিস্তলটা কোমরে গুঁজে রাখতে-রাখতে সহজভঙ্গীতে বলল—'নাম কি তোমার' ?

—'ফ্রান্সিস আমার নাম'—একটু থেমে ফ্রান্সিস বলল 'লা ব্রুশ—সোনার ঘণ্টার গল্প শুনেছো ?'

—হ্যাঁ-হ্যাঁ—ওটা একটা ছেলে ভুলানো আজগুবি গপ্পো।

—না-ওটা গল্প নয়। সেই সোনার ঘণ্টা এখন আমাদের দেশে।

—'বলো কি'। লা ব্রুশ বেশ অবাক হয়ে বলল।

—'হ্যাঁ। বহু দুঃখকষ্ট স্বীকার করে আমি আর আমার বীর বন্ধুরা সেই সোনার ঘন্টা এনেছি। অতবড় হীরে এনেছি, যার জন্যেও কম কষ্ট করিনি'। ফ্রান্সিস একটু থেমে বলল, 'তাই বলছিলাম গুলির ভয় দেখিও না—ফ্রান্সিস মৃত্যুকে ভয় পায় না। কিন্তু এই বলে রাখছি যদি আমাদের বন্ধুদের কাউকে তুমি হত্যা করে থাকো তো তোমার মুক্তি নেই, আমি প্রতিশোধ নেবই'।

লা ব্রুশ খুক্-খুক্ করে হেসে উঠে বলল—'হাতে হাতকড়া, তাও শেকলে বাধা। প্রতিশোধের কথা ভাবতে-ভাবতেই জীবন শেষ হয়ে যাবে'।

—'বেশ থাক না আমার জীবন। আমার বীর বন্ধুরা রয়েছে, তারা প্রতিশোধ নেবে—আমার ভাই রয়েছে, সে তোমাকে খুঁজে বের করে প্রতিশোধ নেবে। আমরা ভাইকিং'।

ফ্রান্সিসের কথা শেষ হতে না হতেই সবাই একসঙ্গে চীৎকার করে উঠল ও—ও—হো-হো—ও। চীৎকার থামলে ফ্রান্সিস বলতে লাগল, 'লা-ব্রুশ আমার বন্ধুদের জিজ্ঞেস করে দেখ, তোমার চাইতে অনেক সুখে, অনেক স্বাচ্ছন্দের মধ্যে আমি জীবন কাটাতে পারতাম। কিন্তু আমি সেই সুখ-স্বাচ্ছন্দের নিশ্চিন্ত জীবন ঘৃণা করি। আমি ভালোবাসি ঝড়-বিক্ষুব্ধ সমুদ্রবিপদ, দুঃখ-কষ্টের জীবন। মানুষের জীবনের এখানেই সার্থকতা। এই শেষকথা জেনে যাও লা ব্রুশ, মৃত্যুকে আমি ভয় পাই না। তোমার মত একটা জলদস্যুকে তো নয়ই'। আবার একটু থেমে বলল, 'তোমরা তো কাপুরুষ। নিরস্ত্র অবস্থায় আমাদের বন্দী করেছ। আমাদের হাত খুলে দাও, আর একটা করে তরোয়াল দাও—ধুলোর মত উড়ে যাবে তোমরা।'

সবাই একসঙ্গে চীৎকার করে উঠল ও—হো—হো—ও।

লা ব্রুশ আর কোন কথা না ব'লে কাঠের পা ঠক্-ঠক্ করতে করতে চ'লে গেল। তারপর বেনজামিন দরজায় তালা লাগিয়ে দিল। ফ্রান্সিস আস্তে-আস্তে ব'সে পড়ল। তখন ও রাগে ফুঁসছে। রক্তাক্ত কবিজর দিকে তাকিয়ে ও চুপ ক'রে ব'সে রইল। ওর পাশে হ্যারিও চুপ ক'রে বসে রইল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে হ্যারি ডাকল—'ফ্রান্সিস ?'

—বলো।

—লা ব্রুশের কথা থেকে কিছুই বোঝা গেল না। দু'জনকে পাহারায় রেখে এসেছে মানেটা কি ? পালালোই বা কে ?

—কিছুই বুঝতে পারছি না।

ফ্রেদারিকো আস্তে-আস্তে এগিয়ে আসছে। দু'জনে ওর দিকে তাকাল। ফ্রেদারিকো ফ্যাস্‌ফেসে গলায় বলল—'ফ্রান্সিস, বুঝলে কিছু।'

ফ্রান্সিস মাথা নাড়ল। ফ্রেদারিকো মাথা ঝাঁকিয়ে বলল—'বোধহয় ওদের চারজনের কেউই বেঁচে নেই।'

—বলো কি ?

—জলদস্যুদের রীতিনীতি আমি ভালো ক'রেই জানি। ওরা ওদের গুপ্তধন ভাণ্ডারের মধ্যে লুটের মাল রাখতে যাদের নিয়ে যায়, তাদেরই হত্যা করে রেখে আসে। এতে কারো পক্ষে গুপ্তধন ভাণ্ডারে খোঁজ পাওয়ার উপায় থাকে না। তার উপর ওদের একটা কুসংস্কারও আছে। যাকে বা যাদের মেরে রাখা হয়, তারা নাকি জিন হয়ে সেই গুপ্তধন পাহারা দেয়।

ফ্রান্সিস অস্পষ্টস্বরে বলল—'তাহ'লে ওরা কেউ বেঁচে নেই।'

—'একজন পালিয়েছে বলল—হয়তো সেই বেঁচে আছে।'

ফ্রান্সিস দীর্ঘশ্বাস ফেলল! কিন্তু কদ্দিন বাঁচবে। ডাইনীর দ্বীপ নাম। বুঝতেই তো পারছো কী ভয়াবহ জায়গা। তারপর বললো—'আচ্ছা ফ্রেদারিকো, তুমি কখনো ডাইনীর দ্বীপে গেছো' ?

—একবার-তাও দিনের বেলা। ইয়া বড়-বড় কত যে জোঁক ঐ দ্বীপে। আধঘন্টার মধ্যে আমরা পালিয়ে এসেছিলাম। তোমাদের যে বন্ধু পালিয়েছে, সে যদি জোঁকে'র হাত থেকে বাঁচবার উপায় বার করতে পারে, তাহলে হয়তো বেঁচে যেতে পারে। কারণ, এখানে প্রচুর পাখী আছে আর মিঠে জলের ঝরনা আর হ্রদ আছে।

—'তুমি তাহলে এইদিকে কয়েকবার এসেছো' ? হ্যারি বলল।

—'হ্যাঁ, বেশ কয়েকবার। এরই দক্ষিণে কয়েকশো মাইল দূরে চাঁদের দ্বীপ।'

ফ্রান্সিস আধশোয়া হয়ে এতক্ষণ হারানো বন্ধুদের কথা, কি উপায়ে এখান থেকে পালানো যায়, এসব নানা কথা ভাবছিল। হঠাৎ চাঁদের দ্বীপ কথাটা কানে যেতে ও সজাগ হয়ে উঠে বসে বলল—'ফ্রেদারিকো তুমি কিন্তু চাঁদের দ্বীপ, মৃত্যুর সমুদ্র এসবের কথা আর কিছুই বললে না।'

ফ্রেদারিকো কিছুক্ষণ ফ্রান্সিসের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে তারপর ফ্যাসফেসে গলায় বলল, 'ফ্রান্সিস, তোমাকে আমি বেশ কয়েকদিন লক্ষ্য করলাম।' একটু চুপ ক'রে থেকে বলল—'দেখলাম, তুমিই উপযুক্ত। তোমাকেই সব বলছি। কিন্তু যদি মৃত্যুর সমুদ্রে গিয়ে প্রাণহানি হয়, তখন কিন্তু আমায় দোষ দিতে পারবে না'।

—সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকো। সমস্ত ঘটনাটা আমাকে বলো। তারপর আমি ভেবে দেখবো, আমরা যাবো কি যাবো না।

—'শোন তাহ'লে।' ফ্রেদারিকো কোমর থেকে তামাকপাতা বের ক'রে মুখে ফেলে চিবুতে-চিবুতে বলতে লাগল—'তোমাকে আগে কিছু ঘটনা ব'লেছি। আবার বলি শোন। একটা মালবাহী জাহাজে কাজ করতাম তখন। জাহাজটা ফিরছিল আফ্রিকার এক বন্দর থেকে। প্রচণ্ড ঝড়ের পাল্লায় পড়ে জাহাজটা অনেক দক্ষিণদিকে চলে গিয়েছিল। ফিরে আসছি, তখনই আমাদের ফেরার পথে পড়ল চাঁদের দ্বীপ। আমার জাহাজ জীবনে

অনেকের মুখেই চাঁদের দ্বীপের কথা শুনেছি। এবার চোখে দেখলাম। দূর থেকে দেখা গেল কাঁচের পাহাড়।'

—'কাঁচের পাহাড় মানে'? ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করল।

—'দ্বীপের উত্তরদিকে অনেকটা জায়গা জুড়ে এই কাঁচের পাহাড়। যেন কাদার তাল শুকিয়ে নিরেট পাথর হ'য়ে গেছে! এমন এবড়ো-খেবড়ো মাটি-পাহাড় গড়া প্রকৃতির এক অদ্ভুত খেয়াল। সেই এবড়ো-খেবড়ো পাথরগুলো এমন ছুঁচালো আর ধারালো যেন ভাঙা কাঁচের মত। সেখানে পা রাখার উপায় নেই। পা ফালা-ফালা হয়ে যাবে। পা পিছলে পড়লে তো সমস্ত শরীর টুকরো-টুকরো হ'য়ে কেটে যাবে। কথাটা শুনে বিশ্বাস হয় নি। কিন্তু জাহাজটা যখন কাঁচ পাহাড়ের কাছ দিয়ে যাচ্ছিল, তখন দেখলাম সত্যিই তাই। এবড়ো-খেবড়ো উঁচু-উঁচু পাথরের ছুঁচোলো ডগা। সেই পাহাড়ে ওঠা তো দূরের কথা, পা রাখার উপায় নেই।' একটু থেমে তামাকপাতা চিবোতে-চিবোতে ফ্রেদারিকো আবার বলতে লাগল—'ঐ পাহাড়ের পাশ দিয়ে-দিয়ে আমরা সোফালা বন্দরে এলাম। চাঁদের দ্বীপের ওটাই একমাত্র বন্দর, ঐ যে কাঁচপাহাড় বললাম, তার ও'পাশেই মন্তোর সমুদ্র'।

— 'ও'পাশেই'? ফ্রান্সিস আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করল।

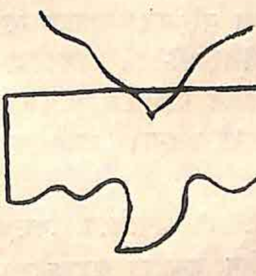
—হ্যাঁ, কিন্তু কাঁচের পাহাড় পেরিয়ে যাওয়া শুধু অসম্ভব নয়, অকল্পনীয়।

—তারপর?

—জাহাজটা সোফালা বন্দরে নোঙর ক'রে রইল। আমরা দ্বীপটা ঘুরে-ঘুরে দেখলাম। কিন্তু সব জায়গায় আমাদের যাওয়ার হুকুম ছিল না। লম্বা-লম্বা বর্শা হাতে সব পাহারাদাররা ঘুরে বেড়াচ্ছে। বিশেষ ক'রে উত্তর-পূর্বমুখো যেদিকে মন্তোর সমুদ্র, সেদিকে যাওয়ার উপায় ছিল না।

ফ্রেদারিকো একটু থামল। তারপর গলায় ঝুলানো ভাঙা আয়নার অংশটা গলা থেকে খুলল। আয়নাটার উল্টোপিঠে যেখানে পারা লাগানো থাকে, সেইদিকে কি যেন খুঁটতে লাগলো, কালচে চামড়ার মত কি যেন একটা খুঁটে-খুঁটে তুলছে। যখন খুঁটতে-খুঁটতে সবটা তুলে ফেলল, তখন দেখা গেল এক টুক্‌রো সাদাটে চামড়া। ওটা ফ্রান্সিসের হাতে দিয়ে ফ্রেদারিকো বললো—'এই দেখ চাঁদের দ্বীপের আর মন্তোর সমুদ্রের নক্সা।'

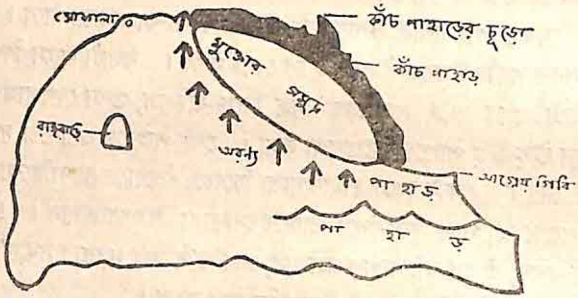
নক্সাটা দেখতে ছিল এই রকম—



ফ্রান্সিস হাতে নিয়ে মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগল। দ্বীপটা দেখতে ঠিকই আধ-

খানা চাঁদের মত। নক্সাটা ভোঁতা করলে একরকম কালো কালি দিয়ে আঁকা নক্সা। দেখে কিছুই বোঝার উপায় নেই। কিছু লেখাও নেই।

ফ্রেদারিকো আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে-দেখিয়ে সব বোঝাল। ফ্রান্সিস মনে-মনে সেগুলোর নাম ভেবে নিয়ে তারপর ম্যাপটাকে উল্টো করে ধরতেই একটা স্পষ্ট নক্সা ফ্রান্সিসের চিন্তায় ধরা দিল। সেটা দাঁড়াল ঠিক এই রকম—



ফ্রেদারিকো বলতে লাগল—'একদিন রাজবাড়ি দেখতে গেলাম। নামেই রাজবাড়ি। ট্রাভেলার্সট্রীর পাতা দিয়ে ছাওয়া বাড়ি। ঐ গাছের মূল শিরা থেকে দরজা তৈরি করা হ'য়েছে। এই ট্রাভেলার্সট্রী যে এদের কত কাজে লাগে, তা বলবার নয়। এই গাছের পাতায় গোড়ায় জল জমা থাকে। নাড়ালেই প্রচুর মিষ্টি জল পড়ে। পাতার গোড়া ফুটো করলেও জমা জল পড়ে'। ফ্রেদারিকো একটু ভেবে বলতে লাগলো—'রাজবাড়ির প্রবেশপথের মাথায় মরা মানুষের মাথার খুলি সারি-সারি সাজানো। ভেতরে ঢুকে রাজসভা দেখলাম, বৃদ্ধ রাজা কাঠের তৈরি সিংহাসনে ব'সে আছে। আশ্চর্য! রাজার মাথা ন্যাড়া। একটিও চুল নেই। পরে শুনলাম, কাঁচ পাহাড়ের পাথর দিয়ে ঘষে-ঘষে চুল তুলে ফেলা হয়। রাজার গলায় হাঁসের ডিমের মত আকারের মুক্তোর মালা। রাজার সিংহাসনেও মুক্তো বসানো। পরনে সর্বাঙ্গ ঢাকা সাটিনের কাপড়। রাজপুরোহিত, সেনাপতি মন্ত্রী সকলের গলাতেই মুক্তোর মালা। রাজসভার জাঁকজমক নেই। কিন্তু রাজাকে সবাই মান্য ক'রে চলে। চারদিকে বর্শা হাতে ভাজিম্বা সৈন্যরা পাহারা দিচ্ছে।

একটু থেমে ফ্রেদারিকো বলতে লাগল—'রাজসভার কাজ চলছে। তখনই দেখলাম রাজপুরোহিত উঠে দাঁড়িয়ে মাথা নীচু ক'রে রাজাকে কি বলল। রাজা ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে রাজপুরোহিতের দিকে তাকিয়ে কী ব'লে উঠল। তখনই লক্ষ্য করলাম রাজপুরোহিতের গলায় একটা ভাঙা আয়না লকেটের মত ঝুলছে। পরে ঐ ভাঙা আয়না আমি পেয়েছি। আসলে ওটা ছিল জোড়া দেওয়া দু'টো আয়না। তারই একটা আমার গলায় ঝুলছে।'

—অন্য ভাঙা আয়নাটা?

—'সেই কথাটাই এবার বলবো।' ফ্রেদারিকো কিছুক্ষণ তামাক-পাতা চিবুলো। তারপর বলতে লাগল—'পরের দিন আমাদের জাহাজ সোফালা বন্দর ছেড়ে ইউরোপের দিকে পাড়ি দেবে। আগের দিন রাত্রিবেলা। অসহ্য গরম। সমুদ্রেও বাতাস পড়ে গেছে, আমাদের কয়েকজন ডেক-এ ব'সে গল্পগুজব করছি, হঠাৎ দেখি ডেকের ওপর দিয়ে

একটা লোক টলতে-টলতে আসছে। একটু লক্ষ্য ক'রে বুঝলাম লোকটা ভাজিম্বা, তবে সাধারণ ভাজিম্বারা যা পরে, ওর পরনে তা নয়। ওর পরনে সাটিনের কাপড়। কোমরে সিল্কের কাপড়ের ফেট্টি। একটু চাঁদের মেটে আলোতে এসব লক্ষ্য করলাম। আমি ছুটে গিয়ে ওকে ধরলাম। দেখি কাঁধের দিকে কাপড় রক্তে ভিজে উঠেছে। কাপড়টা সরাতেই লক্ষ্য করলাম কাঁধে বর্শার আঘাতের গভীর ক্ষত। দর্‌দর্‌ করে রক্ত পড়ছে। আমি দু'হাতে ওকে জড়িয়ে ধ'রে আমার কেবিন ঘরে নিয়ে এলাম। ও দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। উবু হ'য়ে আমার বিছানায় শুয়ে পড়ল। আমি ছেঁড়া কম্বলের টুকরো দিয়ে ক্ষত জায়গাটা চাপা দিলাম। রক্তপড়া যখন কমলো, তখন আমার ছেঁড়া জামার টুকরো দিয়ে একটা পট্টি বেঁধে দিলাম। এতক্ষণ ভাজিম্বাটি গোঙাছিল, কথা বলতে পারছিল না। এবার ভাঙা-ভাঙা পর্তুগীজ ভাষায় জল খেতে চাইল। আমি ওকে জল খেতে দিয়ে বিশ্রাম করতে ব'লে ছুটলাম জাহাজের বৈদ্যির কাছে। বৈদ্যিকে নিয়ে যখন এলাম, দেখলাম রক্তপড়া অনেক কমেছে। বৈদ্যি ওর চোঙের পাত্র থেকে মাখনের মত এক-রকম ওষুধ বের করল। পট্টি খুলে ছেঁড়া কম্বলের টুকরো খুলে ফেলে আস্তে-আস্তে মাখনের মত ঐ ওষুধটা লাগিয়ে দিয়ে পট্টি বেঁধে দিল। একটু পরেই রক্তপড়া বন্ধ হল। ওর ব্যথারও বোধহয় উপশম হ'ল। ও ঘুমিয়ে পড়ল। দেখলাম, আহত লোকটি ঘুমিয়ে আছে। আমি আর কি করি ? কাঠের মেঝেতে একটা কম্বল পেতে শুয়ে পড়লাম'।

ঘুম ভাঙলো একটু বেলাতে। উঠেই আহত লোকটির দিকে তাকালাম। দেখি সেও আমার দিকে তাকিয়ে আছে। কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—'কেমন আছো ?' এবার লক্ষ্য করলাম লোকটির বয়স খুবই কম। ছেলে-মানুষই বলা যায়। ও মৃদু হেসে মাথা ঝাঁকাল। বুঝলাম, এখন একটু ভালো বোধ করছে। ওকে রেখে রসুই-ঘ'রে গেলাম। সকালের খাবার খেতে। খেয়েদেয়ে ওর জন্যেও কিছু খাবার লুকিয়ে নিয়ে এলাম। ও খাচ্ছে যখন, তখনই জাহাজের ডেক থেকে জোর-জোর কথা ভেসে এল। অস্পষ্ট হ'লেও ক্যাপ্টেনের গলা শুনলাম। বল্‌ছে—'এই জাহাজে কেউ আসেনি'। বুঝলাম, ছেলেটির খোঁজে নিশ্চয়ই ভাজিম্বারা এসেছে। ধরা পড়লে ছেলেটির মৃত্যু সুনিশ্চিত। যে কারণেই হোক ছেলেটিকে ওরা মেরে ফেলতে চায়। আমি সঙ্গে-সঙ্গে উঠে দাঁড়ালাম। ছুটে গিয়ে ছেলেটির ডান হাত ধ'রে আস্তে টানলাম—'শিগগির আসো।' ছেলেটি তখনও খাওয়া শেষ করে নি। ও একটুক্ষণ আমার দিকে হাঁ ক'রে তাকিয়ে রইল। আমি তাড়া দিলাম 'চলো'। ও খাওয়া ফেলে আমার পিছনে-পিছনে চললো। ছুটে গিয়ে ভাঁড়ার ঘরে ঢুকলাম। চারিদিকে তাকিয়ে লুকোবার জায়গা খুঁজলাম। পেলামও। বড়-বড় ময়দার বস্তার পেছনে যে ফাঁক পেলাম, তাই দেখিয়ে বললাম—'শীগগির লুকাও এখানে। কোনরকম শব্দ করবে না। ভয় নেই, আমি ডেকে নিয়ে যাবো।' ওকে লুকিয়ে রেখে তাড়াতাড়ি কেবিন ঘরগুলোর দিকে এলাম। যে দুই বন্ধু গত রাত্রে আহত ছেলেটিকে দেখেছে, তাদের একজনকে পেলাম। একপাশে ডেকে নিয়ে ফিস্‌ফিস্‌ ক'রে বললাম—'কাল রাত্তিরে যে আহত ভাজিম্বাকে দেখেছো, তার কথা কাউকে ব'লো না।' সে মাথা নেড়ে সম্মত হলো। ওপরে ডেক-এ উঠে এলাম। দেখলাম, কয়েকজন ভাজিম্বা সৈন্য বর্শা হাতে দাঁড়িয়ে আছে, সঙ্গে ওদের সেনাপতি। তার গা খোলা। গলায় ঝুলছে

একটা মুক্তোর লকেট। পরনে সাটিনের কাপড়। কোমরে সিল্কের পট্টি বাঁধা। মুখটা পাথরের মত কঠিন। তার হাতে খোলা তলোয়ার। আমাদের ক্যাপ্টেন তখন বলছে—'যদি কেউ আসতো, তা'হলে নিশ্চয়ই আমাদের নজরে পড়তো।'

কিন্তু সেনাপতির মুখ কঠিন। কথাটা সে বিশ্বাস করেছে ব'লে মনে হলো না। তখনই দেখি গতরাত্রে আমার সঙ্গী অন্য বন্ধুটি ক্যাপ্টেনের কাছে যাচ্ছে। ঐ বন্ধুটি জাতিতে স্প্যানিশ। আমি স্প্যানিশ ভাষায় ব'লে উঠলাম 'সাবধান গতরাত্রির কথা ব'লো না।' বন্ধুটি বুদ্ধিমান। মাথাটা একবার নেড়ে সহজ ভঙ্গীতে ক্যাপ্টেনকে গিয়ে বললো—'কাল বাতাস পড়ে গিয়েছিল। গরমের জন্যে আমরা অনেক রাত পর্যন্ত ডেকে ছিলাম। কাউকে দেখিনি।' ক্যাপ্টেন সেনাপতির দিকে তাকিয়ে বললো—'দেখলেন তো ও বলছে, ওরা কাউকে দেখে নি।' কিন্তু সেনাপতির মুখের ভাবের কোন পরিবর্তন হলো না। ভাঙা-ভাঙা পর্তুগীজ ভাষায় বলল—'ছেলেটি ভীষণ আহত ছিল।' এই কথা বলে সেনাপতি মাথা নীচু ক'রে ডেক-এর ওপর নজর রাখতে-রাখতে জাহাজের পেছনের দিকে যেতে লাগল। সৈন্যরাও সঙ্গে-সঙ্গে চলল। হঠাৎ পেছনদিককার ডেক-এর দিকে একজায়গায় দাঁড়িয়ে পড়লো। বলে উঠল—'রক্ত।' ক্যাপ্টেনও সেখানে গিয়ে দাঁড়াল। দেখলো সত্যই ডেক-এ ফোঁটা-ফোঁটা রক্তের দাগ। সেনাপতি আপন মনে বিড়-বিড় ক'রে বলল—'মাহাবো!'

আমি কাছেই দাঁড়িয়েছিলাম। বুঝলাম, ছেলেটির নাম মাহাবো। সেনাপতি মুখ তুলে ক্যাপ্টেনকে বলল—'জাহাজ দেখবো।'

ক্যাপ্টেন ব'লে উঠল 'বেশ তল্লাশী করুন।'

সেনাপতির সঙ্গের সৈন্যদের নিয়ে জাহাজ তল্লাশী শুরু করল। প্রত্যেকটি কেবিন ঘরে, দাঁড়টানার ঘরে, রসুই-ভাঁড়ার ঘরে ঢুকে দেখল, কিছুই বাদ দিল না। কিন্তু মাহাবোকে কোথাও পেল না। সেনাপতিটি অপ্রসন্নমুখে ডেক-এ রক্তের দাগ-দাগ জায়গাটার কাছে কয়েকবার পায়চারি করলো। তারপর ক্যাপ্টেনকে জিজ্ঞেস করলো—'জাহাজ কবে ছাড়ছেন?'

ক্যাপ্টেন বললো—'আমাদের তো লেনদেনের কাজ মিটে গেছে। আমরা আজকেই জাহাজ ছাড়বো।'

সেনাপতি মাথা ঝাঁকাল—'না আজ জাহাজ যাবে না।'

—'কেন!' ক্যাপ্টেন বেশ অবাক হলো।

সেনাপতি কাল্‌চে ছোপ লাগা দাঁত বের ক'রে হাসল। মনে হ'লো মুখ ভ্যাংচাল। তারপর পর্তুগীজ ভাষায় বলল 'আমি কামেরোকে আনতে যাচ্ছি। ওকে নিয়ে আসা পর্যন্ত ভাজিম্বা সৈন্যরা এখানেই থাকবে।' তারপর চোখ পিট্‌-পিট্‌ করে বলল 'কামেরোকে জানেন? রক্তের গন্ধ শুঁকে ও আহত শিকার ধ'রে আনে গভীর জঙ্গল থেকে'। ওর নাকটা ছোট, কিন্তু ওর নাককে ফাঁকি দেওয়া অসম্ভব।'

সেনাপতি আর কোন কথা না ব'লে জাহাজ থেকে নোঙরের দড়ি ধ'রে-ধ'রে নৌকায় নেমে গেল। একাই বেয়ে চললো সোফালা বন্দরের দিকে। সৈন্যরা জাহাজেই রইল।

ফ্রেদারিকো এতক্ষণে থামল। ফ্রান্সিস তাড়া দিল—'মুক্তোর-সমুদ্রের ব্যাপারটা বলো।'

—বলছি-বলছি—সব বলবো। তার আগে একটু জল খাবো। খুব তেষ্টা পেয়েছে।'

হ্যারি একটু স'রে গিয়ে জলের জালা থেকে নারকেলের মালা দিয়ে জল ভরে নিয়ে এল। ফ্রেদারিকো ঢক-ঢক ক'রে জল খেল। তলানি যে জলটুকু ছিল, তাই দিয়ে চামড়ায় আঁকা নক্সাটা ভেজাল। তারপর আবার ভাঙা আয়নাটার পেছনে সেঁটে দিল। আবার কোমরের গাঁট থেকে তামাকপাতা বের করলো। মুখে ফেলে চিবুতে-চিবুতে বলল—'আমি বিপদ আঁচ করলাম। এরকম জংলী মানুষের কথা আমি শুনেছিলাম। শিকারীরা এদের নিয়ে জঙ্গলে শিকার করতে যায়। আহত জানোয়ারের রক্তের গন্ধ শুঁকে-শুঁকে, যেখানেই জানোয়ারটা থাকুক না কেন ঠিক বের করে। কামেরো সেই রকম জংলী মানুষ। জাহাজী বন্ধুদের আমার কেবিনঘরে জড়ো করলাম। সব বললাম। জংলী কামেরো এলে ভাজিম্বা ছেলেটিকে ও খুঁজে বের করবেই। তবে একটা বাঁচোয়া। রক্তটা বাসি হ'য়ে গেছে ধরতে পারবে না মনে হচ্ছে। কিন্তু সাবধানের মার নেই। যদি 'মাহাবো' অর্থাৎ ছেলেটি ধরা পড়ে, তবে আমাদের কাজ হবে সেনাপতি-শুদ্ধ সব ক'টা সৈন্যকে জলে ফেলে দেওয়া আর এক মুহূর্ত দেরী না করে জাহাজ ছেড়ে দেওয়া।

'কিন্তু ক্যাপ্টেন কি রাজি হবে?' একজন জাহাজী বন্ধু বলল।

'ক্যাপ্টেনকে বোঝাবার দায়িত্ব আমি নিলাম।' ওদের বললাম, 'তোমরা শুধু সেনাপতি আর সৈন্যদের জলে ফেলে দিতে সাহায্য ক'রো। ওরা রাজি হলো।'

একটু থেমে ফ্রেদারিকো বলতে লাগল—'আমি সঙ্গে-সঙ্গে ক্যাপ্টেনের সঙ্গে দেখা করলাম। গতরাত্রের সব ঘটনা বললাম। ক্যাপ্টেন কয়েকবার মাথা নেড়ে বললো—'উহুঁ মাহাবোকে ওদের হাতে তুলে দিতেই হ'বে।'

আমি বললাম—'তাহ'লে ওরা ওকে সঙ্গে-সঙ্গে মেরে ফেলবে।

—'ওসব ওদের ব্যাপার—আমরা ওসবের মধ্যে নেই।' ক্যাপ্টেন বলল।

—তাই ব'লে জেনেশুনে একটা এত অল্পবয়সী ছেলেকে খুনীদের হাতে তুলে দেবেন?

—'উপায় কি?' ক্যাপ্টেন হতাশার ভঙ্গী বরল।

—'উপায় আমরা বের করেছি। কিন্তু আপনি আপনার ঘর থেকে বেরোবেন না।'

—কেন?

—'তাহ'লে আপনার দায়িত্ব থাকবে না। যা করবার আমরাই করবো।'

ক্যাপ্টেন কিছুতেই রাজি হবে না। আমিও নাছোড়বান্দা। আমি আশ্বাস দিলাম 'এই চাঁদের দ্বীপে আবার কবে আসবো—তার ঠিক কি? আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আপনি শুধু ঘর থেকে বেরোবেন না, তাহ'লেই হলো। ক্যাপ্টেন বারকয়েক—আপত্তি ক'রে অবশেষে রাজি হলো।'

একটু থেমে ফ্রেদারিকো বলতে লাগল—'দুপুরের দিকে সেনাপতি নৌকায় চড়ে এল। সঙ্গে সেই জংলী মানুষ কামেরো। জাহাজে উঠেই সেনাপতি ক্যাপ্টেনের খোঁজ করলো। আমরা বললাম, উনি অসুস্থ। নিজের কেবিনে শুয়ে আছেন। সেনাপতি কামেরোকে রক্তের দাগ পড়েছে ডেক-এর যে জায়গায়, সেদিকে নিয়ে চললো। কামেরো উচ্চতায় তিনফুটও হবে না। মাথায় বড়-বড় চুল ওর চোখ-মুখ ঢেকে দিয়েছে। পরনে একটা নেংটি। সারা গায়ে নানারকম নানারঙের উল্কি আঁকা। কামেরো রক্তের শুকিয়ে যাওয়া ফোঁটাগুলোর ওপর উবু হ'য়ে বোধহয় গন্ধই শুঁকলো। মুখ তুলে সেনাপতিকে

কি বললো। বোধহয় বাসি হ'য়ে গেছে ব'লে রক্তের গন্ধ পাচ্ছে না, সে কথাই বলল। কামেরো আবার বার কয়েক গন্ধ শুঁকলো। তারপর ঐ অবস্থাতেই চললো নিচে নামবার সিঁড়ির দিকে। আমরা আগে লক্ষ্য করি নি। এবার লক্ষ্য করলাম, সিঁড়ির কোণের দিকে বেশ কিছুটা রক্ত লেগে আছে। মনে পড়লো, মাহাবো এই জায়গাটায় টাল নিয়ে পড়ে যাচ্ছিল। আমি ধ'রে ফেলেছিলাম। এই জায়গায় তাই ও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়েছিল। তাই ফোঁটা-ফোঁটা রক্ত জ'মে বেশকিছুটা রক্তের দাগ এখানে রয়েছে। কামেরো মুখ উবু অবস্থায় কুকুরের মত একটা লাফ দিল। বুঝলাম, আর উপায় নেই। মাহাবো ধরা পড়বেই। আমি চাপা গলায় বন্ধুদের সে কথা বললাম—সব তৈরি থেকো। এক-জনকে পাঠালাম নোঙরের জায়গায়। আমরা ইসারা করতেই ও যেন নোঙর তুলে ফেলে। অন্যরা সব তৈরি হ'য়ে গেলাম। এবার কামেরো চলল আমার কেবিনঘরের দিকে। সেখানে রক্তমাখা কম্বলের টুকরো ছেঁড়া কাপড় পেল। কামেরো লাফাতে লাগল। তারপর চললো ভাঁড়ার ঘরের দিকে। কপাল মন্দ। ভাঁড়ার ঘরের মধ্যেই পড়ে ছিল রক্তভেজা আর একটা কম্বলের টুকরো। তাড়াতাড়িতে অসাবধানে ওটা পড়ে গিয়ে থাকবে। কামেরো এবার ভাঁড়ার ঘরের চারিদিকে তাকাতে-তাকাতে ঘুরতে লাগল। যে ময়দার বস্তার আড়ালে মাহাবো লুকিয়ে ছিল, কামেরো হঠাৎ সেইদিকে ছুটে গেল। সেনাপতি আর সৈন্যরাও ছুটলো। মাহাবো ধরা পড়ে গেল। আমরা গিয়ে মাহাবোকে ঘিরে দাঁড়ালাম। আমার বন্ধুদের কয়েকজনের হাতে তরোয়াল দেখে সেনাপতি একবার থম্‌কাল। সৈন্যরাও কি করবে বুঝে উঠতে পারলো না। আমিও সেনাপতিকে বললাম—'ওপরে ডেক-এ চলুন।'

—আগে মাহাবোকে আমাদের হাতে ছেড়ে দাও।

—'ঠিক আছে আপনারা ডেক-এ চলুন। আমরা মাহাবোকে নিয়ে যাচ্ছি।'

সেনাপতি কিছুক্ষণ কঠিন দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর —সৈন্যদের অনুসরণ করবার ইঙ্গিত ক'রে ডেক-এ ওঠার সিঁড়ির দিকে চলল। মাহাবোকে আমার কেবিন ঘরে পাঠিয়ে দিয়ে আমরাও ওপরের ডেক-এ উঠে এলাম। মাহাবোকে আমাদের সঙ্গে না দেখে সেনাপতি তাদের ভাষায় চীৎকার ক'রে কি ব'লে উঠলো। সৈন্যরা বর্শা উঁচিয়ে আমাদের দিকে ছুটে আসতে লাগল। আমরাও ভাঙা হালের টুকরো, বড়-বড় পেরেক, আর নোঙরের ভাঙা টুকরো নিয়ে সৈন্যদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম। লড়াই শুরু হলো। আমাদের বন্ধুদের কয়েকজন তরোয়াল ভালোই চালাত। প্রথমেই সেনাপতি ঘায়েল হলো। ওর হাত থেকে তরোয়াল ছিট্‌কে পড়লো। আমরা সেনাপতিকে ধরাধরি ক'রে তুলে ছুঁড়ে জলে ফেলে দিলাম। সেনাপতির এই অবস্থা দেখে সৈন্যদের মনোবল ভেঙে পড়লো। দু'জন বর্শা ফেলে জলে ঝাঁপিয়ে পড়লো। বাকিগুলোকে আমরাই ধরে জলে ফেলে দিলাম। কামেরোকেও জলে ছুঁড়ে ফেলা হলো। ওরা সাঁতরে ওদের নৌকোর দিকে চললো। ততক্ষণে জাহাজের নোঙর তুলে ফেলা হ'য়েছে। দ্রুত হাতে দড়ি দড়া ঠিক ক'রে পাল তুলে দিলাম। দাঁড়িরাও দাঁড় বাইতে লাগল। মুহূর্তের মধ্যে জাহাজ বাইরের সমুদ্রে চ'লে এলো। সোফালা বন্দর, চাঁদের দ্বীপ চোখের সামনে থেকে মুছে গেল। আমরা মহাসমুদ্রে এসে পড়লাম। জাহাজ বেগে চললো উত্তরের দিকে।'

ফ্রেদারিকো থামল। ফ্রান্সিস আর হ্যারি প্রচণ্ড মনোযোগের সঙ্গে ওর গল্প শুনতে লাগল। একটু থেমে ফ্রেদারিকো আবার বলতে শুরু করলো—'মাহাবোকে সুস্থ ক'রে তোলার জন্য আমরা চেষ্টার ত্রুটি করলাম না। ওষুধ-পত্র সেবাশুশ্রূষা সবই চললো। কিন্তু মাহাবো সুস্থ হলো না। বরং ঘা পেকে ফুলে ওর অবস্থা দিন-দিন খারাপ হ'তে লাগল। আমাদের বৈদ্য বললো, যে বর্শা দিয়ে ওকে আঘাত করা হ'য়েছিল, তা'তে নাকি বিষ মাখানো ছিল। বিষক্রিয়ার জন্যই ওই ঘা শুকোবে না, বরং শরীরের অন্য জায়গায়ও বিষ ছড়িয়ে যাবে। মাহাবোকে বাঁচানো যাবে না। কয়েকদিন পরেই মাহাবোর ভীষণ জ্বর এল। ওর শরীরটা কেঁপে-কেঁপে উঠতে লাগল। ও আচ্ছন্নের মত পড়ে রইলো। সেদিন গভীর রাত্রি। আমি মাহাবোর বিছানার পাশে ব'সে ওর মাথায় জলে ভেজা ন্যাকড়া বুলোচ্ছি আর হাওয়া করছি। ও হঠাৎ চোখ খুললো। দেখলাম চোখ—দু'টো লাল টক্‌টক্ করছে। ও কিন্তু সুস্থ মানুষের মতোই ব্যবহার করতে লাগল। আমার হাতটা দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধ'রে ভাঙা-ভাঙা গলায় বলতে লাগল—'বন্ধু তোমার নাম জানিনা, কিন্তু তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। আমার পরিচয় তুমি জানো না। আমি চাঁদের দ্বীপের প্রধান পুরোহিতের একমাত্র সন্তান। চাঁদের দ্বীপের রাজসভা দেখেছো নিশ্চয়ই। কত বড়-বড় মুক্তো দিয়ে রাজসভা সাজানো। রাজা, মন্ত্রী, সেনাপতি সকলের গলায় মুক্তোর মালা। এত সব মুক্তো। সমুদ্র থেকে সংগ্রহ ক'রে আনতো এসব আমার বাবা।

—তোমার বাবা ছাড়া আর কেউ মুক্তো সংগ্রহ করতে পারে না কেন? আমি জানতে চাইলাম।

মাহাবো বলল, 'কারণ মুক্তোর সমুদ্রের প্রহরী লাফ্ মাছ। এই মাছেরা যে কি সাংঘাতিক, কল্পনাও করতে পারবে না। এদের চোখের দৃষ্টি স্থির আর হিংস্র। সমুদ্রের নীচের শ্যাওলা আগাছা এসবের মধ্যে লুকিয়ে থাকে। তীক্ষ্ণ ধারালো দাঁত দিয়ে এরা শিকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। আত্মরক্ষার জন্যে এদের পিঠের শিরদাঁড়াটায় সারি-সারি ফাঁপা ছুঁচের মত কাঁটা থাকে। এই কাঁটাগুলো ওরা শিকারের গায়ে বসিয়ে দেয়। সেই সঙ্গে ফাঁপা কাঁটাগুলোর মধ্যে দিয়ে আঠা-আঠা বিষ ঢেলে দেয়। যার গায়ে ঐ বিষ ঢোকে, সে অসহ্য ব্যথায় অজ্ঞান হ'য়ে যায়। তারপরেই সে মরে যায়। এই হিংস্র লাফ্ মাছ ঐ মুক্তোর সমুদ্রে ঘুরে বেড়ায়। ওদের হাত থেকে বাঁচবার কোন উপায় নেই।'

—'তাহ'লে তোমার বাবা মুক্তো সংগ্রহ ক'রে অক্ষত দেহে ফিরে আসতো কি করে?' আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

—সেটাই রহস্যময়। তবে একটা জিনিস লক্ষ্য করতাম। বাবা মুক্তোর সমুদ্র থেকে ফিরে এলে বাবার গলায় ঝোলানো ভাঙা আয়নাটা থাকতো না। জিজ্ঞাসা করলে বলতেন—'সাঁতরাবার সময় খুলে পড়ে গেছে।' বাবা তার কিছুদিন পরেই ভিনদেশী কোন জাহাজে চড়ে মরিটাস দ্বীপে চ'লে যেতেন। আমি জানি না মরিটাস দ্বীপ কোথায়। কিছুদিন পরে ফিরে আসতেন। গলায় ঝোলানো থাকতো ঠিক অমনি আকারের একটা ভাঙা আয়না। জিজ্ঞাসা করলে বলতেন, বসির আয়নাঅলার কাছ থেকে আয়নাটা তৈরি ক'রে এনেছেন। আমি শুধু এইটুকুই জানতাম।

—তারপর ?

—কয়েকদিন আগের কথা চাঁদের দ্বীপের রাজা বাবাকে ডেকে বললেন—'এই মুক্তো ভিনদেশী লোকেরা মোহরের বিনিময়ে কিনে নিতে চায়। মুক্তোর সমুদ্রে তো অঢেল মুক্তো আছে। এবার আমরা কিছু মুক্তো তুলে বিক্রি করবো।' বাবা ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন—'এই মুক্তো চাঁদের দ্বীপের অধিষ্ঠাতা দেবতার দান। এমনি দিতে পারেন, কিন্তু দেবতার এই দান নিয়ে ব্যবসা করতে পারবেন না।' কিন্তু রাজারও এক গোঁ। বিক্রী করার-জন্যে আরো মুক্তো তোলাবেন। রাজা দু'জন ডুবুরিকে পাঠালেন মুক্তোর সমুদ্র থেকে মুক্তো তুলে আনতে। তারা সেই যে জলে নামলো, আর ওপরে উঠতে পারল না। আমাদের একটা প্রবাদই আছে—'যদি চিরদিনের জন্যে কোথাও যেতে চাও, তাহ'লে মুক্তোর সমুদ্রে যাও।' রাজার যত রাগ গিয়ে পড়লো বাবার ওপর। রাজা বুঝলেন বাবা ছাড়া কেউ অক্ষত শরীরে মুক্তো নিয়ে আসতে পারবেন না। শুরু হলো এর উপায় ব'লে দেবার জন্যে বাবার ওপর দৈহিক অত্যাচার। যখন চরমে উঠলো, বাবা তখন আমার সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন। শাস্তিঘরে দেখলাম, বাবা প্রায় অজ্ঞানের মত পড়ে আছেন। ঐ অবস্থাতেই আমাকে কাছে ডাকলেন। বাবার হাত-বুনো লতা দিয়ে বাঁধা। আমার কানের কাছে মুখ এনে ফিস্-ফিস্ করে বললেন—'আমার গলা থেকে আয়নাটা খুলে নে। এটা জোড়-লাগানো দু'টো আয়না। বসির আয়নাওলার আয়না সঙ্গে থাকলে মুক্তোর সমুদ্রে কোন ভয় নেই।' বাবা আর কিছু বলতে পারলেন না। চোখ বন্ধ ক'রে জোরে শ্বাস নিতে লাগলেন। আমি বাবার গলা থেকে জোড়া-লাগানো আয়নাটা খুলে কোমরে গুঁজে রাখলাম। ব্যাপারটা কিন্তু সেনাপতির তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ধরা পড়ল। ঘর থেকে বেরিয়ে আসতেই সেনাপতি আমাকে বলল, 'দেখি তোমার বাবা তোমাকে কি দিলো।' আমি কোমরে গোঁজা আয়নাটা বের করবার ভান করলাম। চারদিক এই ফাঁকে দেখে নিলাম। এখানে ওখানে মশাল জ্বল্ছে। তখন রাত গভীর। একজন সৈন্য শুধু বর্শা হাতে পাহারা দিচ্ছে। অন্য কয়েকজন গুটিসুটি মেরে ঘরের বারান্দায় ব'সে আছে। আমি সঙ্গে-সঙ্গে এক লাফে আলোর এলাকা ছাড়িয়ে অন্ধকারে পড়লাম। সেনাপতি চেঁচিয়ে উঠল—'মাহাবোকে ধর্—।' ঐ সৈন্যটা সঙ্গে-সঙ্গে অন্ধকারেই আমাকে লক্ষ্য ক'রে বর্শা ছুঁড়ল। ওরা অন্ধকারেও দেখতে পায়। আমি ব'সে পড়্তে-পড়্তে বর্শাটা ছুটে এসে কাঁধে বিঁধল। আমি বর্শাটা টেনে খুলে ফেললাম। রক্ত ছুটল। দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হ'য়ে ছুটলাম। একবার ভাবলাম বনের দিকে যাই। কিন্তু জানতাম কামেরোকে লেলিয়ে দেবে সেনাপতি। ও ঠিক আমাকে খুঁজে বের করবে। তার চেয়ে ভিনদেশী জাহাজে চড়ে পালিয়ে যাওয়া ভালো। তাই অন্ধকারে ছুটতে-ছুটতে এসে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। তারপর তোমাদের জাহাজের এসে উঠলাম।' মাহাবো সমস্ত ঘটনাটা এইভাবে থেমে-থেমে বললো। বুঝতে পারছিলাম ওর খুব কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু মুক্তোর সমুদ্রের রহস্যের টানে ওকে আর থামতে বলিনি। মাহাবো দুর্বল হাতে ওর কোমরের জোড়া আয়নাটা বের ক'রে আমার হাতে দিল। ম্লান হেসে বলল—'যে জন্যে আমার বাবা মারা গেল, যে জন্যে আমিও বাঁচবো না, সেই অমূল্য জিনিসটি তোমাকে দিয়ে যাচ্ছি। অযত্ন ক'রোনা। পারো তো মুক্তো এনো। কিন্তু সেই মুক্তো নিয়ে ব্যবসা ক'রো না। তাহ'লে চাঁদের দ্বীপের

অধীশ্বরের অভিশাপ লাগবে।' এই ছিল মাহাবোর শেষ কথা। শেষরাত্রের দিকে আমার কোলে মাথা রেখে মাহাবো মারা গেল। এই কয়দিনেই ছেলেটির ওপর আমার মায়া পড়ে গিয়েছিল। ওর মৃতদেহটা কোলে নিয়ে আমি ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদলাম।'

ফ্রেদারিকো থামল। ওর গল্পের এই ভাজিম্বা ছেলেটির জন্য ফ্রান্সিস ও হ্যারি দু'জনেই গভীর সহানুভূতি অনুভব করল। দু'জনেই চুপ ক'রে রইলো। ফ্রেদারিকো চুপ ক'রে তামাক চিবোচ্ছে। কিন্তু ওরা দু'জন আর ওকে বলবার জন্যে অনুরোধ করতে পারল না। ফ্রেদারিকো নিজে-নিজেই বলতে শুরু করল—'ফ্রান্সিস তোমাকে সব ঘটনাটাই বলবো। শোন—তারপর বেশ কয়েক বছর কেটে গেছে। আয়নাটা পরে থাকি। লোকে দেখলে হাসে। আমিও আয়নাটায় মুখ দেখি, ভেংচি কাটি। দিন কাটতে লাগল এ জাহাজে, ও জাহাজে ঘুরে-ঘুরে। কিন্তু দক্ষিণ সমুদ্রের দিকে যাবে এমন জাহাজ অনেকদিন চেষ্টা করেও পেলাম না। হঠাৎ একটা জাহাজ পেলাম। শুনলাম, জাহাজটা চাঁদের দ্বীপের সোফালা বন্দরে যাবে। তবে অনেক ক'টা বন্দরে ঘুরে যাবে। আমি সেই জাহাজে খালাসীর কাজ নিলাম। এ বন্দর সে বন্দর ঘুরতে-ঘুরতে জাহাজটা একদিন সোফালা বন্দরে এসে ভিড়ল। মাহাবো বলেছিল, আয়নাটা যেন কোন ভাজিম্বার চোখে না পড়ে। রাজপুরোহিতের আয়না আমার গলায় দেখলে ওরা আমাকে সঙ্গে-সঙ্গে মেরে ফেলবে। কারণ ওরা বিশ্বাস করে যে আয়নাটা মন্ত্রপূত। রাজপুরোহিত ছাড়া আর কারো ওটা পরার অধিকার নেই। একটা কথা বলা হয়নি, আয়নাটা একদিন গলা থেকে খুলে পরিষ্কার করছি। হঠাৎ হাত থেকে পড়ে গেল। আয়নার জোড়াটা খুলে গেল। তখনই ভেতরে সাঁঠা চামড়ায় আঁকা নক্সাটা পেলাম। যা হোক—আমি আয়না দু'টো কোমরে গুঁজে সোফালা বন্দরে নামলাম। তখন রাত হ'য়েছে। ঘন বন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে চললাম মুক্তোর সমুদ্রের দিকে। কিন্তু জানতাম না। যে কেউ যাতে মুক্তোর সমুদ্রে নেমে মুক্তো চুরি করতে না পারে, তার জন্য ভাজিম্বারা মুক্তোর সমুদ্রের এপাশে বনের মধ্যে অনেক ফাঁদ পেতে রেখেছে। কারোর উপায় নেই সেই ফাঁক এড়িয়ে যায়। আমিও পারলাম না। বুনো লতায় তৈরি সেই ফাঁদে হঠাৎ পড়ে গেলাম। খোঁড়া গর্তের মধ্যে পড়লাম। হাত-পা বুনোলতায় জড়িয়ে গেল! সারা রাত ঐ অবস্থায় গর্তের মধ্যে পড়ে রইলাম। হয়তো একটু তন্দ্রামত এসেছিল। তন্দ্রা ভেঙে গেল পাখির ডাকে। ভোর হয়েছে। কত বিচিত্র রকম পাখি। কিন্তু এ সব দেখার অবকাশ কোথায়। ভাজিম্বাদের হাতে ধরা পড়লাম। ভাগ্যে কি আছে কে জানে। একটা বিচিত্র বর্ণের লেমুর তার আঙুলগুলো মানুষের সমান। গর্তটার কাছ দিয়ে কয়েকবার ঘুরে গেল। ভাবলাম, ভাজিম্বাদের হাতে ধরা পড়ার আগে বুনো শুয়োরের দাঁতের ঘায়ে প্রাণটা না যায়।

একটু বেলা হ'তে দূরে কাদের কথাবার্তা শুনলাম। একটু পরেই একদল ভাজিম্বা শিকারী ওখানে এল। ওরা ভেবেছিল, কোন বুনো জানোয়ার বোধহয় ফাঁদে পড়েছে। আমাকে দেখে ওরা খুব অবাক হলো না। হয়তো মুক্তো চুরি করতে এসে অনেকেই এইরকম ফাঁদে ধরা পড়েছে। এটা নতুন কিছু নয়। ওরা আমাকে টেনে তুললো। তারপর বুনো লতায় হাত বেঁধে আমাকে নিয়ে চললো। ওদের লক্ষ্য ছিল যে রাজবাড়ি, সেটা বুঝতে আমার অসুবিধে হ'ল না। কারণ দুটো আয়নার মাঝখানে সাঁঠা চাঁদের

দ্বীপের নক্সাটা দেখে-দেখে আমার প্রায় মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। রাজবাড়িতে যখন পৌঁছলাম, তখন বেশ বেলা হ'য়েছে। বোধহয় রাজাকে আমার ধ'রে আনার খবর দেওয়া হয়েছিল। রাজসভায় রাজা, মন্ত্রী, সেনাপতি একটু পরেই এলেন! সেনাপতি আমাকে ঠিক চিনল। কাল্‌চে ছোপ ধরা দাঁত বের ক'রে দাঁত খিঁচুনি দেওয়ার মত হাসলো। আমার বিচার শুরু হ'ল। সেনাপতি আমাকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে বার-বার রাজাকে কি সব গড় গড় ক'রে ব'লে গেল। ন্যাড়ামাথা রাজা ডান হাতটা ওপরের দিকে তুলে তর্জনীটা উঁচিয়ে ধরলেন, তারপর বেশ জোরে কি যেন বললেন। তারপর মুক্তো বসানো কাঠের সিংহাসন থেকে নেমে চ'লে গেলেন। মন্ত্রী আর উপস্থিত অন্যান্য দু'চারজন গণ্যমান্য ব্যক্তি রাজার পিছু-পিছু চলে গেলেন। সেনাপতি এগিয়ে এসে ভাঙা-ভাঙা পর্তুগীজ ভাষায় বলল —'মুক্তো চুরি করতে এসেছিলি। সেই মুক্তোর সমুদ্রেই তোকে ভাসিয়ে দেওয়া হবে। যত পারিস, মুক্তো তুলে নিস্।' কথাটা ব'লে দাঁত খিঁচিয়ে হাসলো। সৈন্যদের কি হুকুম দিল। ওরা আমাকে টেনে নিয়ে চললো। সৈন্যরা একটা ঘরে আমাকে ঢুকিয়ে দিল। ঘরটা দেখেই বুঝলাম, এটাই শাস্তিঘর। মাহাবোর মুখে এই শাস্তিঘরের কথাই শুনেছিলাম ঘরটার চারদিকে কাঁটাগাছের বেড়া। রেনট্রির পাতায় ছাওয়া ঘর। মেঝেটা মাটির। এব্‌ড়ো- খেব্‌ড়ো। একপাশে একটা মাটির পাত্রে জল রাখা। মাঝখানে একটা জ্বলন্ত উনুন। ধোঁয়ায় চোখ জ্বালা করতে লাগল। গরমে দর্ দর্ ক'রে ঘামতে লাগলাম। কাল রাত্রে সেই জাহাজ থেকে খেয়ে বেরিয়েছিলাম। এখন দুপুর গড়িয়ে বিকেল হ'তে চললো—কিছু খাই নি। ওরা খেতে দেবে ব'লেও মনে হলো না। চুপ ক'রে ব'সে রইলাম। ভাবতে লাগলাম একমাত্র ভরসা কোমরে গোঁজা দু'টো আয়নার টুকরো। আয়নার ধারালো কোণা দিয়ে যদি কোনভাবে পাতার বাঁধন কাটতে পারি। কিন্তু বাঁধন কাটলেই কি পালাতে পারবো? বাইরে ভাজিম্বা যোদ্ধারা পাহারা দিচ্ছে। মাহাবো বলেছিল, 'ওরা নাকি অন্ধকারেও দেখতে পায়।'

একটু থেমে ফ্রেদারিকো বলতে লাগল—এসব সাতপাঁচ ভাবতে-ভাবতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। কিছুই খেতে দিলো না। মাটির পাত্রটায় মুখ চুবিয়ে পেট ভ'রে জল খেলাম। রাত হলো। শাস্তিঘরের সামনের উঠোনে মশাল জ্বালিয়ে দিলো। পাহারা ঠিকই চললো।

একটু রাত হ'তে হঠাৎ পাহারাদার সৈন্যদের মধ্যে ব্যস্ততা লক্ষ্য করলাম। একটু পরেই সেনাপতি এল। সৈন্যদের কি হুকুম করল। ওরা আমাকে ঘর থেকে টেনে বের করল। তারপর সেনাপতির পেছনে-পেছনে আমাকে নিয়ে চলল। চাঁদের দ্বীপের নক্সাটা অনেকবার দেখে আমার সবই জানা হ'য়ে গিয়েছিল। উত্তর-পূর্ব মুখে আমাকে নিয়ে যাচ্ছে, বুঝলাম তার মানে গভীর বন এলাকা পার হয়ে মুক্তোর সমুদ্র। কিন্তু ওরা আমাকে ওখানে নিয়ে যাচ্ছে কেন, বুঝলাম না। সবার আগে যে যোদ্ধাটি চলেছে, তার হাতে মশাল। তারপরেই সেনাপতি। তারপর আমাকে মাঝখানে রেখে সৈন্যরা চলেছে গভীর বনের মধ্য দিয়ে। আমরা চলেছি। বন্য পশুর ডাক শোনা যাচ্ছে মাঝে-মাঝে। রাতজাগা পাখিগুলো তীক্ষ্নস্বরে ডেকে উঠে অন্য গাছে গিয়ে আশ্রয় নিচ্ছে। ঝিঁ-ঝিঁ পোকার একটানা ডাক শোনা যাচ্ছে। এক সময় গভীর বন শেষ হ'য়ে গেল। ছাড়া-ছাড়া গাছপালা শুরু হ'ল। তারপর আগুনে-প্রবালের একটা ঢিবি লম্বা চ'লে গেছে। সেটা দৌড়ে পার হ'তে হলো।

ঢিবিটায় পা রাখা যায় না। এত গরম। তারপরই একটা ল্যাগুন। আকাশে ভাঙা চাঁদ। তারই নিস্তেজ আলোয় দেখলাম ল্যাগুনটার জল স্থির, ঢেউ নেই। ওপারে কাঁচ পাহাড় আর তার বাঁকানো চূড়া! বুঝলাম, এটাই মুক্তোর সমুদ্র। এই মুক্তোর সমুদ্র নিয়েই কত কল্পনা ছিল আমার। কত কথা শুনেছি এর সম্বন্ধে। আজকে সেটা আমার চোখের সম্মুখে। আমি বিস্ময়ে হতবাক হ'য়ে মুক্তোর সমুদ্র দেখেতে লাগলাম।'

একটু থেমে ফ্রেন্সিকো বলতে লাগল, সেনাপতি আমার কাছে এলো। ভেংচিকাটার মত হেসে বলল—'এই দ্যাখ্ মুক্তোর সমুদ্র। ,তোকে ভাসিয়ে দেব। যত পারিস্ মুক্তো তুলিস।'

তারপর চূড়া সুরে কি হুকুম দিলো। সৈন্যরা ছুটে এসে আমাকে ধরলো। টানতে-টানতে জলের ধারে নিয়ে গেল। দেখলাম, জলের ধারে একটা নৌকার মতো বাঁধা। গাছের গুঁড়ি কুড়ে ভাজিম্বারা একরকমের নৌকো তৈরি করে। এটা সেই রকম নৌকো। আমাকে ওরা নৌকোয় তুললো। তারপর বুনোলতা দিয়ে নৌকোর সঙ্গে হাত-পা বেঁধে দিল। ওরা নৌকোটা জোরে ঠেলে দিতে আমি মুক্তোর সমুদ্রের মাঝ বরাবর ভেসে এলাম। বুঝে উঠতে পারলাম না আমাকে না মেরে এভাবে জলে ভাসিয়ে দিল কেন। অবশ্য একটু পরেই এর কারণ বুঝলাম। নৌকাটার তলায় ফুটো, ফুটো দিয়ে নৌকায় ততোক্ষণে জল উঠতে শুরু করেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই নৌকাসুদ্ধ আস্তে-আস্তে ডুবে যাবো। মাহাবো হিংস্র লাফ্ মাছের কথা বলেছিল। এরাই নাকি মুক্তোর সমুদ্রের প্রহরী। একবার জলে পড়লে ওরা সুতীক্ষ্ন দাঁত দিয়ে আমার শরীর ফালা-ফালা ক'রে ফেলবে। ভয়াল মেরুদণ্ডে ফাঁপা কাঁটা বিঁধিয়ে দেবে। আমার মৃত্যু সুনিশ্চিত। ওপরে আকাশে ভাঙা চাঁদ। তারা জ্বল্‌ছে। এই সব কিছু মুছে যাবে। মৃত্যু এসে সব রং আলো মুছে দেবে। চোখের কোণ জলে ভিজে উঠলো। আমি চোখ বু'ঝলাম। হঠাৎ মনটা বিদ্রোহ করল। কেন মরবো? মরবার আগে একবার শেষ চেষ্টা করবো না? হাত-পা বাঁধা এই অবস্থায় মৃত্যুকে মেনে নেব? আমি তাড়াতাড়ি উঠে বসলাম। পারের দিকে তাকালাম। দেখি তিন-চারটে মশাল জ্বলছে। বুঝলাম, ওরা পাহারা দিচ্ছে এখনো। সারা তীরটা জুড়েই পাহাড়া দিচ্ছে। ওরা নিশ্চিত জানে মুক্তোর সমুদ্র থেকে কেউ জীবন নিয়ে ফিরে আসে না। তবু আমার মৃত্যু সম্বন্ধে ওরা নিশ্চিত হ'তে চায়। আমি তাড়াতাড়ি বাঁধা হাত দু'টো নিয়ে কোমরের গোঁজা খুঁজলাম। আয়না দু'টো রয়েছে। অনেক কষ্টে একটা আয়না বের করলাম। তারপর আয়নাটার বাঁকা ছুঁচোলো মুখটা হাতের তলাটায় ঘষতে লাগলাম। ভাগ্যি ভাল লতাটা শুকনো ছিল না। কাঁচা লতা-গাছটা ঘষতে-ঘষতে লতাটা কাটতে লাগলাম। হাতটা অবশ্য অক্ষত রইল না। কেটে গিয়ে রক্ত পড়তে লাগল। হাত ধরে একটু বিশ্রাম করি। আবার ঘষি। কিছুটা ছিঁড়ে আসতে জোরে হ্যাঁচ্‌কা টান দিলাম। লতাটা ছিঁড়ে গেল। ততক্ষণে নৌকার অর্দ্ধেকটা ডুবে গেছে। বাঁধা পা দু'টো জলের নিচে। এবার পায়ের তলাটা কাটতে লাগলাম। পা'টাও আয়নার কোণার খোঁচা লেগে কেটে গেল। রক্ত পড়তে লাগল। বেশ কিছুক্ষণ এক টানা ঘষার পর পায়ের বন্ধনটা

কেটে গেল। ভাবলাম, নৌকো থেকে ঝাঁপ দিয়ে জলে পড়ি। কিন্তু তাতে শব্দ হবে। শব্দ শুনলে সেনাপতির, ভাজিম্বা সৈন্যদের সন্দেহ হ'তে পারে। তাই আমি নৌকোটার সঙ্গে-সঙ্গে আস্তে-আস্তে জলের নীচে তলিয়ে গেলাম। প্রতি মুহূর্তেই আশঙ্কা করছি লাফ্ মাছগুলো ছুটে আসবে। ছুঁচোলো ধারালো দাঁত নিয়ে আমার শরীরটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ফালা-ফালা ক'রে দেবে। নয়তো পিঠের ফাঁপা কাঁটা ফুটিয়ে দেবে। হঠাৎ জলের নীচে দেখি এক আলোর আভাস। তাহ'লে এইখানেই কি মুক্তো আছে? আমি ভুলে গেলাম মৃত্যুদূত লাফ্ মাছের কথা। আমি তাড়াতাড়ি সেই আলো ধ'রে নীচে নেমে এলাম। সে এক অপরূপ দৃশ্য। ওখানের তলাটা একটু এবড়ো খেবড়ো হলেও সমান। তার ওপর বড়-বড় মুক্তো ছড়িয়ে পড়ে আছে। একটা তীব্র নীলচে আলো বেরোচ্ছে মুক্তোগুলো থেকে। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে মুক্তোগুলোকে। মুক্তোগুলো পড়ে আছে মেঝের মত জায়গাটায়। আর চারপাশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে বড়-বড় আকারে ঝিনুক কল্পনাই করা যায় না। কোন-কোন ঝিনুকের মুখ খোলা। তার মধ্যে মুক্তো। সেই আলোকিত জায়গাটার দিকে তাকিয়ে আছি। হঠাৎ ডানহাতে একটা প্রচণ্ড ধাক্কায় আমার হাত থেকে আয়নাটা মেঝের মত জায়গাটায় পড়ে গেল। সেই আয়নাটা থেকে তীব্র আলো বিচ্ছুরিত হ'তে লাগলো। দেখলাম, একটা ছাইরঙা মাছ ঐ আয়নার মধ্যে প্রচণ্ড জোরে ঢুঁ মারল, ওটা নিশ্চয়ই মৃত্যুদূত লাফ্ মাছ। আরো লাফ্ মাছ ছুটে আসছে দেখলাম। আমার দম ফুরিয়ে এসেছিল। আমি দ্রুত ওপরে উঠতে লাগলাম। তাড়াতাড়ি জলের ওপর পেঁছিলাম। দেখলাম, এখানে জলের গভীরতা বেশী নয়। এবার আয়নার রহস্যটা পরিষ্কার হ'য়ে গেল। আয়নাটার একটা বৈশিষ্ট্য আমি লক্ষ্য করছিলাম যে, এর আলো প্রতিবিম্বিত করার ক্ষমতা সাধারণ আয়নার চেয়ে অনেকগুণ বেশি। এই আয়না মাছেদের আকৃষ্ট করে। মাছগুলো তখন পাগলের মত আয়নাটায় ঢুঁ মারতে থাকে। ভুলে যায়, ধারে-কাছে কোন শিকার আছে কিনা। লক্ষ্যই করে না কিছু। রাজ পুরোহিত তাই এই আয়না নিয়ে মুক্তো তুলতে আসতেন। যখন লাফ্ মাছেরা ঢুঁ দিতে ব্যস্ত, তখন উনি মুক্তো সংগ্রহ ক'রে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জলের ওপরে উঠে আসতেন। তারপর সাঁতরে পারে উঠতেন। আমি এইসব ভাবতে-ভাবতে জলের ওপর ভেসে থেকে অনেকটা দম নিলাম। তারপর একডুবে নীচে নেমে গেলাম। হাতের কাছে যে মুক্তোটা পেলাম, সেটা নিয়ে উঠে আসছি, দেখি আয়নাটার কাছে অনেকগুলো লাফ্ মাছ জড়ো হয়ে ক্রমাগত ঢুঁ দিচ্ছে জায়গাটার জল রক্তে লাল হ'য়ে উঠেছে। হয়তো মাছগুলোর মুখ থেঁতলে গেছে। আমি তাড়াতাড়ি উঠে এলাম। দূরের পারের দিকে তাকালাম। পারে দূরে-দূরে তিন জায়গায় তিনটে মশাল জ্বলছে। ওদিক দিয়ে পালানো অসম্ভব। মুক্তোটা কোমরে গুঁজে আমি কাঁচ পাহাড়ের দিকে সাঁতরাতে লাগলাম। ঐ কাঁচপাহাড়টাই পেরোতে হবে। যেদিকে আগ্নেয়গিরি সেদিকটায় দেখলাম, জল থেকে খাড়া পাহাড় উঠে গেছে। আবার পারের ওদিকে ভাজিম্বা সৈন্যদের নিয়ে সেনাপতি ঘুরে-ঘুরে বেড়াচ্ছে। কাজেই কাঁচপাহাড় ছাড়া অন্য কোন দিক দিয়ে পালাবার উপায় নেই। কাঁচপাহাড়ের কাছাকাছি এসেছিলাম বোধহয়, তখনই হঠাৎ নীচের দিকে একটা টান অনুভব করলাম। আমি আর একটু সাঁতরে এসেছি, হঠাৎ এক প্রচণ্ড জলের টানে আমি তলিয়ে গেলাম। সেই টানে আমি কোথায় ভেসে

চললাম জানি না। প্রায় অজ্ঞানের মতো হ'য়ে গেলাম। হঠাৎ দেখি আমি কাচপাহাড় পেরিয়ে এসেছি। সামনে মহাসমুদ্রে চলে আসাটা আজও আমার কাছে রহস্যময় থেকে গেল।'

ফ্রেদারিকো থেমে থু-থু ক'রে চিবোনো তামাকপাতা ফেললো। আবার কোমরে গোঁজা তামাকপাতা নিয়ে মুখে ফেলে চিবুতে লাগল।

—আচ্ছা জলের টানটা কি নীচু থেকে এসেছিল? ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করল।

—হ্যাঁ।

—তুমি কি তলিয়ে গিয়েছিলে?

—হ্যাঁ। সে কি টান!

—হুঁ। তারপর? ফ্রান্সিস বলল।

—তারপর সাঁতরেই সোফালা বন্দর চ'লে এলাম। নিজের জাহাজে উঠলাম। মুক্তোটা বেশ কিছুদিন সকলের চোখের আড়ালে লুকিয়ে রেখে-ছিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারলাম না। জাহাজের সবাই মুক্তোটার কথা জেনে গেল। বাধ্য হ'য়ে সবাইকে মুক্তোটা দেখালাম। সকলেই বিস্ময়ে হতবাক হ'য়ে গেল। এতবড় মুক্তো? মানুষের কল্পনার বাইরে। জাহাজী বন্ধুদের কাছে আমার কদর বেড়ে গেল। ক্যাপটেনও আমাকে সমীহ করতো?

—তারপর?

—ওটাই আমার বিপদের কারণ হলো। লা ব্রুশ আমাদের জাহাজ অধিকার করলো। সবাইকে এই কয়েদঘরে বন্দী করে। জাহাজ লুঠ করলো। তখনই নিজে বাঁচবার জন্যে আমাদের ক্যাপটেন এক চাল চাললো। ক্যাপটেন বলল—'যদি আমাদের সবাইকে ছেড়ে দাও, তা'হলে তোমাকে হাঁসের ডিমের মত একটা মুক্তো দিতে পারি।' লা ব্রুশের চোখ লোভে চক্-চক্ করে উঠল। ও রাজী হলো। আমার কাছ থেকে ও মুক্তোটা ছিনিয়ে নিলো। আর সব বন্ধুরা মুক্তি পেলো। জাহাজে ক'রে চ'লে গেলো। আমি কিন্তু মুক্তি পেলাম না। সেই থেকে এই কয়েদঘরে আছি। কতদিন, কতবছর জানি না। লা ব্রুশ এখানে এসে কখনো ধমকায়, চাবুক মারে। কখনো ওর ঘরে নিয়ে আমার কাছ থেকে জানতে চায় মুক্তোর সমুদ্র থেকে কি ক'রে মুক্তো নিয়ে অক্ষত দেহে ফিরে আসা যায়। মারের মুখে আমি সবই বলেছি। কিন্তু বলি নি এই আয়নার কথা, চাঁদের দ্বীপের নক্সার কথা। কাঁচ পাহাড় কি ক'রে পেরোলাম, সেই রহস্য তো আমি নিজেও আজ পর্যন্ত ভেদ করতে পারি নি।

ফ্রেদারিকো থামলো। তারপর আস্তে-আস্তে বললো—"ফ্রান্সিস তোমাকে সবটাই বললাম। কিন্তু তুমি না গেলেই ভালো। ভাজিম্বাদের একটা প্রবাদই আছে—'যদি চিরদিনের জন্যে কোথাও যেতে চাও, তা'হলে মুক্তোর সমুদ্রে যাও।"

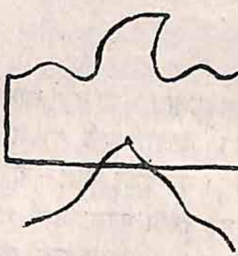
ফ্রান্সিস কোন কথা বললো না। পেছনের কাঠে ঠেসান দিয়ে চুপ ক'রে চোখ বন্ধ ক'রে ব'সে রইল। গভীর ভাবে ভাবতে লাগল ফ্রেদারিকোর বলা সমস্ত ঘটনাগুলো। মুক্তোর সমুদ্রে পোঁছানোর সমস্যার সমাধান সহজ না হ'লেও খুব কঠিন নয়। অরণ্য অঞ্চলে ভাজিম্বাদের পাতা ফাঁদগুলো সম্পর্কে সাবধান হ'লেই নিরাপদে মুক্তোর সমুদ্রে পোঁছোনো যাবে। কিন্তু তারপর? লাফ্ মাছের আক্রমণ থেকে নিজেকে বাঁচানো গেলেও মুক্তোর সমুদ্র থেকে বেরিয়ে আসবে কী ক'রে? ফ্রেদারিকো যখন অক্ষত দেহে বেরিয়ে আসতে

পেরেছে, তখন সুড়ঙ্গ বা গভীর খাদ একটা কিছু আছে। কিন্তু সেটা কোথায় আছে? ফ্রেদারিকোর কথা থেকে সঠিক কোন উপায় বের করা যাচ্ছে না। তবে কি আয়নাটার মধ্যেই কোন রহস্য আছে? আয়নাটা ভালভাবে পরীক্ষা করলেই হয়তো সমাধানেই ইঙ্গিত পাওয়া যেতে পারে। ফ্রান্সিস গভীর ভাবে এই সমস্যার নানা সমাধানের কথা ভাবতে লাগল। কিন্তু ভেবে-ভেবে কোন কুল-কিনারা পেল না। ফ্রেদারিকো জলের টানে বেরিয়ে এসেছিল। এটা কোন গর্ত বা সুড়ঙ্গ বা খাদের অস্তিত্বের কথা বোঝাচ্ছে। কিন্তু সেটা সঠিক কোথায়, ফ্রেদারিকো তাও বলতে পারছে না। সমুদ্রের-জোয়ার ভাঁটার সঙ্গে এর কোন সম্বন্ধ আছে কিনা কে জানে। ফ্রান্সিস এবার চোখ খুলল। বললো—ফ্রেদারিকো তোমার আয়নাটা একবার দাও তো।

—কেন?

—দেখি, ওটা থেকে এর রহস্য ভেদ করা যায় কিনা।

ফ্রেদারিকো গলা থেকে দড়িতে বাঁধা আয়নাটা ওকে দিল। ফ্রান্সিস খুব মনোযোগ দিয়ে ভাঙা আয়নাটা দেখতে লাগল। আয়নাটা দেখতে এই রকম—



ফ্রান্সিস আয়নাটা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখতে লাগল। ও একটা জিনিস বুঝল, যে আয়নাটা ওভাবে ভাঙে নি। ঐ রকম আঁকাবাঁকা ছুঁচোলো মুখ ক'রে ওটা কাটা হ'য়েছে। আয়নাটার পেছনে পারার পলেস্তারা বেশ মোটা। তাই আলো প্রতিফলনের ক্ষমতা এই আয়নাটার অনেক বেশি। আয়নাটার অনেক বেশি। আয়নাটা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে নানাভাবে দেখেও ফ্রান্সিস কিছুই বুঝে উঠতে পারলো না। আর পাঁচটা সাধারণ আয়না থেকে এর কাঁচটা মোটা। এইটুকুই বুঝল শুধু। আয়নাটা বিশেষ যত্নে তৈরী, এটা বুঝতে অসুবিধা হল না। আয়নাটার নীচের দিকে একটা ফুটো। ঐ ফুটোর মধ্যে দিয়ে দড়ি গলিয়ে লকেটের মত গলায় ঝুলিয়ে রাখার ব্যবস্থা। এই জন্যে কি ফুটোটা করা হ'য়েছে, না ফুটোটার অন্য কোন তাৎপর্য আছে। গলায় ঝুলিয়ে রাখার সুবিধের জন্যেই ফুটোটা করা হয়েছে। এ ছাড়া আর কি কারণ থাকতে পারে? ও আয়নাটা ফ্রেদারিকোকে দিল।

দিন যায়, রাত যায়। ক্যারাভেল চলেছে। হঠাৎ একদিন রাত্রে ফ্রেদারিকো ভীষণ অসুস্থ হ'য়ে পড়ল। ওর ভীষণ জ্বর এলো। প্রায় অজ্ঞানের মত অসাড় পড়ে রইলো? বেনজামিন লুকিয়ে এনে ওষুধ এনে দিলো। ফ্রান্সিস ওষুধ খাওয়ালো। দু'তিনবার ওষুধ পড়তে একটু সাড় এলো শরীরে। ওরা মনে করলো হয়তো বিপদ কাটলো! ফ্রেদারিকো অসুস্থ হ'য়ে পড়েছে শুনে লা ব্রুশ কাঠের পা দিয়ে ঠক্ ঠক্ করতে-

করতে এল। ফ্রেদারিকোর সামনে দাঁড়িয়ে ডাকল—'এই ফ্রেদারিকো—আর ঢঙ্ দেখিও না।'

'—ও সত্যিই অসুস্থ' ফ্রান্সিস বলল—'ওর হাত খুলে দিতে বলুন।'

লা ব্রুশ খুক্ খুক্ ক'রে হেসে উঠল—'কিস্সু হয়নি—দু' ঘা চাবুক পড়লেই উঠে দাঁড়াবে।'

ফ্রান্সিস চুপ করে রইলো। কোন কথা বললো না। লা ব্রুশ বেনজামিনকে ডেকে বলল—'বৈদ্যিকে ডেকে নিয়ে আয় তো।'

একটু পরেই জাহাজের বৈদ্যি এলো। লা ব্রুশ ওকে বলল—'দ্যাখ তো ও সত্যিই অসুস্থ, না ঢঙ করছে।'

বৈদ্যি ফ্রেদারিকোকে কিছুক্ষণ পরীক্ষা করল। তারপর বলল—ও ভীষণ অসুস্থ। বোধহয় আর বাঁচবে না।

—'সে কি?' লা ব্রুশ চেঁচিয়ে উঠল—'আর দু'একদিনের মধ্যেই আমরা চাঁদের দ্বীপে পোঁছবো। ফ্রেদারিকোকে তখন খুবই প্রয়োজন। ওকে তুমি যে ক'রেই হোক আর ক'টা দিন বাঁচিয়ে রাখো।

—'চেষ্টা করবো ক্যাপটেন।' বৈদ্যি বলল। লা ব্রুশ বেন্‌জামিনকে ডাকল—'ফ্রেদারিকোর শুশ্রূষা দেখাশুনার ভার তোর ওপর রইলো। দেখিস্ যেন পট্ ক'রে ম'রে না যায়।' বলে ব্রুশ চ'লে গেল।

বেনজামিনও বেরিয়ে গিয়ে। একটু পরেও ছেঁড়া পালের টুকরো আর একগাদা খড় খড় নিয়ে এলো। ফ্রেদারিকো যেখানে শুয়ে ছিল, সেখানে খড় ছড়িয়ে দিলো তার ওপর ছেঁড়া পালের কাপড় পেতে দিলো। বেশ একটা বিছানার মত হলো। ফ্রেদারিকোর হাতের কড়া খুলে ওকে আস্তে-আস্তে ঐ বিছানায় শুইয়ে দিলো। বৈদ্যি আবার কিছুক্ষণ ফ্রেদারিকোকে পরীক্ষা করে তারপর ওষুধ খাওয়ালো। একটু রাত হ'তে বৈদ্যি চ'লে গেল। বেনজামিন এক ঠায় ফ্রেদারিকোর মাথার কাছে ব'সে রইল। ও রাত্রে একবারের জন্যেও উঠলো না। নিজে গেলও না।

ভোরের দিকে ফ্রেদারিকো বোধহয় একটু সুস্থ বোধ করল। এ'পাশ থেকে ওপাশ ফিরল। তখন জ্বরটাও বোধ হয় কমের দিকে। বেনজামিন ওর কপালে হাত দিলো। ওকে একটু সুস্থ দেখে নিজের কাজে চলে গেল।

তখনই ফ্রেদারিকো ইসারায় ফ্রান্সিসকে কাছে ডাকল। ফ্রান্সিস এগিয়ে এলে ফ্রেদারিকো দুর্বল হাতে গলা থেকে আয়নাটা খুলে ওর হাতে দিল। ক্ষীণ কণ্ঠে বলল—'ফ্রান্সিস, তোমাকে আমি উপযুক্ত মানুষ ব'লে মনে করি। সব কথা তোমাকে বলেছি। কিছুই গোপন করি নি। সাহস থাকলে তবেই মুক্তো এনো। কিন্তু সেইসব মুক্তো নিয়ে কোনোদিন ব্যবসা ক'রো না।'

ফ্রান্সিস মাথা নীচু ক'রে রইলো। কোন কথা বলল না। আয়নাটা দু-একবার উল্টে-পাল্টে দেখে কোমরে গুঁজে রাখলো।

একটু বেলা হ'তে লা ব্রুশ কাঠের পা ঠক্-ঠক্ করতে করতে এলো। খুক্-খুক্ ক'রে হেসে ফ্রেদারিকোর মাথার কাছে এসে দাঁড়াল। বললো—শুনলাম, ভালো আছো? তা'হলে এবার মুক্তোর সমুদ্রে রহস্যটা বলো।

—আমি যা জানি বলেছি, আর কিছু জানি না।

লা ব্রুশ চীৎকার ক'রে উঠল—'মিথ্যাবাদী ফেরেরবাজ! তুই আমার কাছে সব কথা বলিস্ নি।' একটু থেমে বলল 'সেরে ওঠ্, তারপর চাবুকে তোর পিঠের চামড়া তুলবো।' লা ব্রুশ চ'লে গেল। বেন্জামিন ফিরে এসে ফ্রেদারিকোর কাছে বসলো। ওকে একটা ওষুধ খাইয়ে বেন্জামিন বলল—'ক্যাপ্টেন কি জানতে চায় ব'লে দিলেই তো পারো। কতদিন আর চাবুকের মার খাবে?'

—'তুই পাগল হ'য়েছিস্ বেন্জামিন—ঐ রকম একটা নরঘাতক শয়তানকে মন্ত্রোর সমুদ্রের রহস্য বলে দেব? অসম্ভব।' দুর্বল শরীরে যতটা গলার জোর দিয়ে বলা সম্ভব ফ্রেদারিকো বললো। বেনজামিন আর কোন কথা না বলে নিঃশব্দে চলে গেলো।

দুপুরের দিকে ফ্রেদারিকো ফ্রান্সিসকে ডেকে বলল—'কপালে হাত দিয়ে দেখো তো, মনে হচ্ছে আবার জ্বরটা বাড়ছে।'

ফ্রান্সিস কড়ায় বাঁধা হাত দু'টো ফ্রেদারিকোর কপালে রাখলো। দেখল বেশ গরম। বুঝল বেশ জ্বর এসেছে। মিথ্যে ক'রে বল—'জ্বরটা সামান্য বেড়েছে, ও কিছু না সেরে যাবে।'

ফ্রেদারিকো কোন কথা বলল না। চোখ বুঁজে চুপ ক'রে শুয়ে রইল।

তখন সন্ধ্যে হ'বে। ফ্রেদারিকো মাথা এপাশ-ওপাশ ক'রে গোঙাতে লাগল। ভীষণ জ্বরে ওর গা পুড়ে যাচ্ছে। একটু পরেই ও জ্ঞান হারিয়ে ফেললো। ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বেন্জামিনকে ডাকতে লাগলো। বেন্জামিন কয়েদ ঘরে ঢুকেই ফ্রেদারিকোর কাছে দৌড়ে এলো। কপালে হাত দিয়েই বুঝলো অবস্থা ভালো নয়। ও ছুটলো বৈদ্যিকে ডাকতে। বৈদ্যি সব দেখে শুনে ওর চিবুকের ছুঁচালো দাড়িতে হাত বুলোলো কয়েকবার। তারপর ঝোলা থেকে একটা ওষুধ বের ক'রে বেন্জামিনকে দিলো খাইয়ে দেবার জন্যে। কিন্তু ফ্রেদারিকোকে ওষুধ খাওয়ানো গেলো না। দাঁতে-দাঁত লেগে আছে। মুখে ঢেলে দিতে ওষুধটা মুখের কষ বেয়ে পড়ে গেলো। বৈদ্যি একটু মাথা নেড়ে হতাশার ভঙ্গি করল। তারপর ওর ঝোলাটা নিয়ে চলে গেলো। কিছুক্ষণ পরে কয়েকটা জোর ঝাঁকুনি দিয়ে ফ্রেদারিকোর দেহটা স্থির হ'য়ে গেল। ওর শরীরটা আস্তে-আস্তে একেবারে ঠাণ্ডা হ'য়ে গেল। ফ্রান্সিস ওর গায়ে হাত দিলো। দেখলো বরফের মত ঠাণ্ডা। বুকে কান পাতলো, কোন শব্দ নেই। নাকের কাছে হাত রাখলো। নিঃশ্বাস পড়ছে না। ও তখনও একটা কাঁচের পাত্রে জল ঢেলে ওষুধ গুলছিল! ফ্রান্সিস ডাকলো—'বেন্জামিন।'

বেন্জামিন কোন কথা না ব'লে ফ্রান্সিসের দিকে তাকাল। ফ্রান্সিস মৃদুস্বরে বলল—'ফ্রেদারিকো মারা গেছে।'

বেন্জামিন বিশ্বাস করলো না। ও ফ্রেদারিকোর কপালে হাত রাখলো। বুকে হাত রাখল। তারপর মাথাটা নাড়তে লাগল। ফ্রেদারিকোর শরীরে কোন সাড় নেই। বেন্জামিনের গোল মুখ কুঁচকে উঠল। ও দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। ফ্রান্সিসরা সকলেই অবাক চোখে বেন্জামিনের দিকে তাকিয়ে রইল। এই পাথরের মত কাল্চে কঠিন মুখের মানুষটার মধ্যে তা'হলে স্নেহ-ভালোবাসার অস্তিত্ব আছে। অন্য সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাহ'লে ওর কোন পার্থক্য নেই। আশ্চর্য! বেন্জামিনের কঠিন

ভাবলেশহীন মুখে কোন কিছু বোঝার উপায় ছিল না।

সারারাত ফ্রেদারিকোর মৃতদেহটা ঘরের বিছানাতেই পড়ে রইল। পরদিন সকালবেলা একজন জলদস্যু এল। মাথা ঢাকা রুমাল, গলায় একটা ভাঁজকরা সিল্কের চাদরের মত। বোঝা গেল, কেউ মারা গেলে এই লোকটাই পাদ্রীর কাজ করে। পাদ্রীর হাতে একটা শতচ্ছিন্ন বাইবেল। বাইবেলটা একবার ফ্রেদারিকোর কপালে ছোঁয়ালো। তারপর বাইবেল থেকে কিছুটা পড়ল। 'আমেন' ব'লে কপালে, বুকে, কাঁধে, হাতে ছুঁইয়ে ক্রুশের চিহ্ন আঁকল। তারপর চলে গেল। বেন্‌জামিন আর দু'জন পাহারাদার ফ্রেদারিকোর মৃতদেহটা ধরাধরি ক'রে নিয়ে গেল সমুদ্রে ফেলে দেবার জন্যে।

ফ্রেদারিকোর মৃত্যুসংবাদ শুনে লা ব্রুশের মুখের ভাব কেমন হলো, সেটা আর ফ্রান্সিসদের সঙ্গে দেখা হ'ল না। তবে সংবাদটা শুনে লা ব্রুশ যে খুব মুষড়ে পড়েছিল, এ বিষয় কোন সন্দেহ নেই। ফ্রান্সিস ভাবল, এর পরে লা ব্রুশ বোধহয় চাঁদের দ্বীপে আর যাবে না। ওর এই অনুমানটা হ্যারিকে বললো। হ্যারি কিন্তু মাথা নেড়ে বলল—উঁহু—দেখো—ও চাঁদের দ্বীপে যাবেই। মুক্তোগুলো ও হাতছাড়া করবে না কিছুতেই।

হ্যারির অনুমানই ঠিক হলো দু'দিন পরেই লা ব্রুশের ক্যারাভেল 'সোফালা' বন্দরে ভিড়ল। পেছনে বাঁধা ফ্রান্সিসদের জাহাজটা।

তখন সবে ভোর হ'য়েছে। 'সোফালা' নামেই একটা বন্দর। এমন কিছু বড় বন্দর নয়। জাহাজঘাটা বলে কিছুই নেই। জাহাজ থেকে নৌকো ক'রে পারে যেতে হয়। সেদিন বন্দরটায় আর কোন জাহাজ ছিল না।

বেলা হ'লে দু' চারজন ভাজিম্বা বন্দরে এসে দাঁড়াল। ওরা বোধহয় মালপত্র বয়ে নিয়ে যাওয়া আসা করে। পণ্য বিনিময়ে প্রথায় সেই সময়ে চললেও লা ব্রুশ তো জলদস্যু ওর জাহাজে বিনিময় যোগ্য পণ্য থাকার কথা নয়। ছিলও না। তবু বড় সর্দারকে সঙ্গে নিয়ে লা ব্রুশ নৌকোয় চড়ে সমুদ্র দিকে চলল। লা ব্রুশ বেশ জমকালো পোষাক পরেছে। কোমরের বেল্ট-এর ওপর জড়ির কাজকরা সিল্কের কাপড়ের কোমরবন্ধ। তাতে হাতির দাঁতের বাটঅলা তলোয়ার গোঁজা। পিস্তলটা নেয়নি। মাথার টুপিটা পরিষ্কার। পায়ের পোষাকটার সোনালী জড়িগুলো চক্‌-চক্‌ করছে। পায়ের একটা বুট ঘষে-ঘষে বেশ পরিষ্কার করা হ'য়েছে। গোঁফ মোম দিয়ে পাকিয়ে ছুঁচালো করা হ'য়েছে। বড় সর্দার কিন্তু সেই মার্কামারা গেঞ্জী গায়ে। পায়ে বুট জুতো। লা ব্রুশ কিন্তু হাঁসের ডিমের মতো মুক্তো বসানো গলার হারটা পরে নি। ওর যে মুক্তোর সমুদ্রের একটা মুক্তো আছে, এটা ও প্রকাশ করলো না। এটা তার বুদ্ধির পরিচয় দিল। সমুদ্রের তীরে নেমে তারা দু'জন বালিয়ারির ওপর দিয়ে হেঁটে চলল। লক্ষ্য রাজবাড়ি। যে দু'চারজন ভাজিম্বা এসে বালিয়ারিতে দাঁড়িয়ে ছিল, তারা বেশ অবাক হ'য়ে লা ব্রুশের পোষাক, তরবারি এসব দেখতে লাগল। বড় সর্দারকে সঙ্গে নিয়ে লা ব্রুশ চললো রাজবাড়ির উদ্দেশ্য।

তীরভূমির বালি ছাড়াতেই দেখা গেল দু'তিনটে বড়-বড় ঘর। সেই রেনাট্রির পাতা বাকল দিয়ে তৈরি। এগুলো গুদাম ঘর! তামাকপাতা মধু, এসব এই ঘরগুলোতে রাখে। বিদেশী জাহাজ আসে। কাপড়, চিনি এসব জিনিসের সঙ্গে ভাজিম্বা ব্যবসাদারেরা

পণ্য বিনিময় করে, এই জন্যেই এখানে গুদামঘর করা হ'য়েছে।

গুদামঘরগুলো ছাড়িয়ে লা ব্রুশ আর বড় সর্দার হেঁটে চললো। এই জায়গাটায় রাজার মত ব'সেছে। বুনো ফল, আনারস, নানা রকম সামুদ্রিক মাছের পসরা নিয়ে ভাজিম্বা ব্যবসাদারেরা বসেছে। এখানে ভাজিম্বাদের ভিড় হ'য়েছে। লা ব্রুশ আর বড় সর্দার চলেছে। অনেকেই চেয়ে-চেয়ে ওদের দেখেছে।

লা ব্রুশ যখন রাজবাড়ি পৌঁছল, তখন একটু বেলা হ'য়েছে। রাজদরবার তখনও শুরু হয় নি। শুধু সেনাপতি আর কিছু দ্বাররক্ষী দরবারঘরে রয়েছে সেনাপতি একটা কাঠের আসনে বসে আছে। লা ব্রুশ সেনাপতিকে জিজ্ঞাসা করলো—'রাজা কখন আসবে?'

—'আসার সময় হ'য়ে এসেছে।' সেনাপতি ভাঙা-ভাঙা পর্তুগীজ ভাষায় বলল। একমাত্র সেনাপতিই পর্তুগীজ ভাষা একটু বোঝে। ভাঙা-ভাঙা বলতেও পারে।

কিছুক্ষণ পরে কয়েকজন লাল সার্টিনের কাপড় পরা কয়েকজন রক্ষী খোলা তরোয়াল হাতে দরবার ঘরে ঢুকলো। তাদের পেছনে-পেছনে ন্যাড়া মাথা রাজা ঢুকলো। তার সঙ্গে মন্ত্রী আর গণ্যমান্য ব্যক্তিরা কয়েকজন ঢুকলো। যে যার কাঠের আসনে বসলো। রাজা মুক্তো বসানো কাঠের সিংহাসনে বসলো।

একপাশ একটি ভাজিম্বা স্ত্রীলোক দাঁড়িয়েছিল। সেনাপতি তাকে গিয়ে কি বললো। স্ত্রীলোকটি হাউমাউ করে কেঁদে উঠল। তারপর রাজার দিকে তাকিয়ে চীৎকার ক'রে কি বলতে লাগলো। ওর বলা শেষ হ'লে রাজা ডানহাত ওপরের দিকে তুলে তর্জনী উঁচু ক'রে কি বলল। স্ত্রীলোকটি চোখ মুছে—সেনাপতির দিকে তাকিয়ে রইলো। সেনাপতি কি যেন বললো। স্ত্রীলোকটি তখন হাসতে-হাসতে চ'লে গেলো।

তখন সেনাপতি লা ব্রুশের কাছে এসে বললো—'আপনার নাম কি'?

—বলুন যে লা ব্রুশ এসেছে। কিছু সওদা করতে চায়।

সেনাপতি তখন রাজার কাছে গেল। আস্তে-আস্তে কি বললো। রাজা লা ব্রুশকে কাছে আসার ইঙ্গিত করল। লা ব্রুশ এগিয়ে রাজার কাছে এলে রাজা ডান হাতটা বাড়িয়ে দিল। লা ব্রুশ রাজার তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুল চুম্বন ক'রে শ্রদ্ধা জানাল। শ্রদ্ধা জানাবার এই রীতিটা লা ব্রুশ আগে থেকে জানতো। তারপর রাজা কি জিজ্ঞেস করলেন। সেনাপতি কাছে এগিয়ে এলো। পর্তুগীজ ভাষায় রাজার প্রশ্নটা বললো—তুমি কি সওদা করতে চাও? লা ব্রুশ. বললো—'আমার সঙ্গে দু'টো মস্ত বড় হীরের খণ্ড আছে। তার একটা আপনাকে দিতে চাই। বদলে আমাকে দেড়'শ মুক্তো দিতে হবে।'

সেনাপতি কথাটা ভাজিম্বা ভাষায় রাজাকে বুলল। রাজা দু' একবার ন্যাড়া মাথাটা ঝাঁকালেন। তারপর বললেন—'আগে হীরের খণ্ডটা দেখবো, তারপর কথা হবে।'

'—বেশ—কখন দেখতে আসবেন বলুন'—লা ব্রুশ বললো।

'—বিকেলে যাবো'—রাজা বললেন।

কথাবার্তা এখানেই শেষ হলো। ততক্ষণে দু'জন-একজন ক'রে আরো কয়েকজন বিচারপ্রার্থী এসে জড়ো হ'য়েছে। লা ব্রুশ বড় সর্দারের সঙ্গে ফিরে এলো।

বিকেল নাগাদ লা ব্রুশ ফ্রান্সিসদের জাহাজের ডেক-এ দাঁড়িয়ে রাজার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল। সঙ্গে বড় সর্দার।

একটু পরেই চাঁদের দ্বীপ থেকে অনেকগুলো নৌকো এই জাহাজের দিকে আসছে দেখা গেল। নৌকাগুলো যখন এগিয়ে এলো, দেখা গেল, মাঝখানের নৌকোটায় রাজা ব'সে আছেন। অন্য নৌকোগুলোতে সেনাপতি, মন্ত্রী ও নানা অমাত্যরা।

রাজা-মন্ত্রী-সেনাপতি আর অন্যান্য ব্যক্তিরা জাহাজটায় উঠে এল। হীরে রাখা গাড়ি দু'টোর কাছে তাদের নিয়ে গেল লা ব্রুশ। রাজা, সেনাপতি, মন্ত্রী আর গণ্যমান্য ব্যক্তিরা ঘুরে-ঘুরে হীরে দু'টো দেখলো। ওদের চোখে গভীর বিস্ময়। হীরে দু'টোর ওপর অস্তগামী সূর্যের আলো পড়ল। বিচিত্র রঙের খেলা চলল হীরে দু'টোর গায়ে। রাজা খুব খুশী। কয়েকবার নিজের ন্যাড়া মাথা হাত বুলিয়ে দিলেন। রাজা সেনাপতিকে ডেকে বললেন, 'আমরা দু'টো খণ্ডই নেবো।' সেনাপতি সে কথা লা ব্রুশকে বললো। লা ব্রুশ মাথা নেড়ে বলল—'না—একটা খণ্ডই আমরা বিক্রী করব।'

কথাটা সেনাপতি রাজাকে বলতেই ক্রোধে রাজার মুখ আরক্ত হলো। রাজা চীৎকার ক'রে বলে উঠলেন—'দু'টো খণ্ডই আমার চাই।' রাজা আর দাঁড়ালেন না। জাহাজ থেকে সবাই নৌকোয় নেমে গেল। নৌকোয় চড়ে সবাই ফিরে গেল চাঁদের দ্বীপে।

লা ব্রুশ এবার বুঝল, সাবধান হবার সময় এসেছে। ভাজিম্বারা যে কোন মুহূর্তে আক্রমণ করতে পারে হীরে দু'টোর লোভে। তাই লা ব্রুশ গোলন্দাজ জলদস্যুদের ডাকলো। হুকুম দিল—'কামান, গোলা সব তৈরি রাখো। তৈরি হও সব।'

জলদস্যুরা অস্ত্রঘর থেকে অস্ত্রশস্ত্র এনে ডেক-এ জড়ো করল। সবাই তৈরি হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

রাত হ'তে লাগল। জলদস্যুরা জাহাজের ডেক-এ সারিবন্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল। লা ব্রুশ অধীর হ'য়ে কাঠের পা ঠক্ ঠক্ ক'রে ডেক-এ পায়চারি করতে লাগল। সময় বয়ে চললো। রাত গভীর হ'তে লাগল।

হঠাৎ দেখা গেল সোফালার সমুদ্র তীরে মশাল হাতে ভাজিম্বা যোদ্ধারা জড়ো হ'তে লাগল। হাজার-হাজার মশালের আলোয় সমুদ্রতীরে ভরে গেল। ওরা নৌকায় চড়ে লা ব্রুশের ক্যারাভেল-এর দিকে আসতে লাগল।

লা ব্রুশ একদৃষ্টিতে এতক্ষণ তাকিয়েছিল মশালের আলোয় উজ্বল সমুদ্রতীরের দিকে। এবার লা ব্রুশ কোমর থেকে তরোয়াল বের করল। শূন্যে তরোয়ালের কোপ দেবার মন চালিয়ে চীৎকার ক'রে উঠল 'গোলা ছোঁড়ো।' দু'টো কামান সঙ্গে-সঙ্গে গর্জে উঠল। কামানের গোলা দু'টো অন্ধকার দিয়ে জ্বলন্ত উল্কার মতো গিয়ে পড়লো সমুদ্রতীরে। আর্ত চিৎকার উঠল ভাজিম্বা সৈন্যদের মধ্যে। একটুক্ষণ বিরতির পর আবার আগুনের গোলা ছুটল। পড়ল গিয়ে মশাল হাতে ভাজিম্বা সৈন্যদের মধ্যে। আবার আর্ত চীৎকার উঠল। এবার দেখা গেল, মশালগুলো ছত্রভঙ্গ হ'য়ে গেছে। এরমধ্যে বেশ কিছু ভাজিম্বা সৈন্য নৌকা বেয়ে ক্যারাভেলের গায়ে লাগল। ক্যারাভেল থেকে ঝোলানো দড়ি-দড়া নোঙরের দড়ি এসব বেয়ে ভাজিম্বা সৈন্যরা অদ্ভুত তৎপরতার সঙ্গে ক্যারাভেলের ডেক-এ উঠে আসতে লাগল। শুরু হলো সম্মুখ যুদ্ধ। জলদস্যুদের হাতে তরোয়াল। ভাজিম্বা সৈন্যদের হাতে লম্বা বর্শা। ওরা বর্শা ছুঁড়ে দু'জন জলদস্যুকে ঘায়েল করলো। কিন্তু বর্শা হাতছাড়া হওয়াতে নিরস্ত্র অবস্থায় ওদের মৃত্যুবরণ করতে হলো। আস্তে-

আস্তে ভাজিম্বা সৈন্যদের অনেকেই মারা পড়ল। যে দু'একজন বেঁচে ছিল, তারা বর্শা ফেলে দিয়ে সমুদ্রে লাফিয়ে পড়ল। ওদিকে তখনও কামানের গোলা ছুটছে। সমুদ্র-তীরে বহু ভাজিম্বা সৈন্য মারা পড়ল। যারা নৌকায় চড়ে এসেছিল, তাদের অনেকে জলদস্যুদের হাতে মারা পড়ল। ভাজিম্বারা হেরে যেতে জলদস্যুরা চীৎকার ক'রে উঠলো।

কামানের গোলার শব্দ যুদ্ধের হৈ-হল্লা ফ্রান্সিসরা কয়েদঘরে ব'সে শুনতে পাচ্ছিল। বেশ কিছুক্ষণ যুদ্ধ চলার পর যখন জলদস্যুরা এক সঙ্গে মিলে জয়ধ্বনি দিলো তখন ওরা বুঝল, যুদ্ধ শেষ। ভাজিম্বারা পরাজয় বরণ করেছে। ফ্রান্সিস ডাকল—'হ্যারি ?'

হ্যারি চিন্তিতস্বরে বলল—'হুঁ, লা ব্রুশ যুদ্ধে জিতে গেল।'

—ভাজিম্বারা জিতলে তবু মুক্তির আশা ছিল কিন্তু এখন। ফ্রান্সিস আর কথাটা শেষ করলো না।

—হাল ছেড়ে দিলে চলবে না। একটা উপায় বার করতেই হবে।

ফ্রান্সিস কোন কথা না ব'লে কাঠে ঠেসান দিয়ে চোখ বুজে আধশোয়া হ'য়ে রইল।

লা ব্রুশ খুব খুশি। ও এটাই চাইছিল। ওর পরিকল্পনাই ছিল চাঁদের দ্বীপ অধিকার করা। তা'হলেই মুক্তোর সমুদ্র হাতের মুঠোয়, যত খুশি মুক্তো তোলা যাবে। মুক্তো বিক্রী করে, হীরে বিক্রী ক'রে ও কোটি-কোটি গিনির মালিক হবে। তখন জলদস্যুগিরি ছেড়ে নিজের দেশে চলে যাবে। প্রচুর জায়গা জমি কিনে রাজপ্রাসাদের মত বাড়ি তৈরি ক'রে রাজার হালে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেবে।

ভোর হলো। লা ব্রুশের কয়েকজন জলদস্যু জলে নামল। যে সব নৌকাগুলো চড়ে ভাজিম্বারা এসেছিল, সেগুলো সমুদ্রের এখানে-ওখানে ভাসছিল। জলদস্যুরা সে-সব নৌকাগুলো ক্যারাভেল-এর কাছে নিয়ে এল। সে সব নৌকাগুলোতে জলদস্যুরা উঠল। ক্যারাভেল-এর সঙ্গে যে নৌকাটা থাকে, সেটাতেই জালে ক'রে লা ব্রুশকে নামিয়ে দেওয়া হলো। লা ব্রুশ আর অন্য জলদস্যুরা নৌকায় চড়ে চললো সোফালা বন্দরের দিকে। আজ কিন্তু লা ব্রুশের গলায় ঝুলছে মুক্তোর লকেট বসানো মালাটা।

ওরা সমুদ্রতীরে পেঁাছে দেখলো, কামানের গোলায় এখানে-ওখানে নানা জায়গায় গর্ত হ'য়ে গছে। বহু ভাজিম্বা সৈন্যদের মৃতদেহ সমুদ্রতীরে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে আছে। সবার সামনে লা ব্রুশ। হাতে খোলা তরোয়াল। কোমরে গোঁজা পিস্তল। ওর পেছনেই বড় সর্দার। তারপর অন্য জলদস্যুরা। সবার হাতেই খোলা তরোয়াল।

ওরা রাজবাড়ি পেঁাছে দেখলো রাজবাড়ি খাঁ-খাঁ করছে। জনপ্রাণী-এর চিহ্নমাত্র নেই। লা ব্রুশ আস্তে-আস্তে গিয়ে কাঠের সিংহাসনে বসলো। খুশিতে হা-হা ক'রে হাসতে লাগল। জলদস্যুরাও ক্যাপ্টেনের হাসির সঙ্গে যোগ দিল। কিন্তু মুক্তোর খোঁজ করতে গিয়ে দেখা গেল, একটা মুক্তোও রাজদরবারে নেই। শুধু সিংহাসনে যে ক'টা মুক্তো গাঁথা ছিল, সে ক'টাই আছে শুধু। লা ব্রুশ রেগে আগুন হ'য়ে গেল। ক্রুদ্ধস্বরে বড় সর্দারকে হুকুম দিল— 'রাজা-সেনাপতি এরা সব কোথায় লুকিয়ে খুঁজে বের কর। কোন দয়া-মায়া দেখাবে না। যাকে পাবে কচুকাটা করবে।'

হৈ-হৈ করতে জলদস্যুরা তরোয়াল হাতে বেরিয়ে পড়লো। সব ঘর বাড়ি খুঁজতে লাগল। স্ত্রীলোক, শিশুদের অবাধে হত্যা করতে লাগল। পুরুষ যাদের পেল, কিছু

মেরে ফেলল—কিছুকে ধ'রে এনে শাস্তিঘরে পুরল। কিন্তু কেউ রাজা বা সেনাপতির কোন হদিস দিতে পারল না।

রাজবাড়িতে গিয়ে জলদস্যুরা লা ব্রুশকে এই সংবাদ দিল। লা ব্রুশ চীৎকার ক'রে বলল—'নিশ্চয়ই জঙ্গলে লুকিয়েছে। সব ক'টাকে খুঁজে বের কর।'

সর্দার কয়েকজন বড় সর্দার কয়েকজন জলদস্যুকে রাজা সেনাপতি আর অন্যদের খুঁজে বের করবার ভার দিল। তারা বনের দিকে চলে গেলো।

লা ব্রুশ কাঠের সিংহাসন থেকে সব ক'টা মুক্তা বের ক'রে নেবার হুকুম দিল। জাহাজে মেরামতে কাজ করে, কাঠের কাজ জানা এক জলদস্যু মুক্তোগুলো বের করবার জন্যে ছেনি-বাটালি-হাতুড়ি নিয়ে এল। লা ব্রুশ বড় সর্দারকে বলল 'যে কটা ভাজিম্বাকে ধরেছো, আমার কাছে নিয়ে এসো।'

শাস্তিঘর থেকে আট-দশজন ভাজিম্বাকে লা ব্রুশের সামনে আনা হ'ল। লা ব্রুশ ওদের দিকে তাকিয়ে বললো—'তোমাদের মধ্যে যে আমাদের মুক্তোর সমুদ্র থেকে মুক্তো এনে দিতে পারবে, তাকেই আমি ছেড়ে দেব।'

বন্দী ভাজিম্বারা লা ব্রুশের কথা এক বর্ণও বুঝলো না। ওরা নির্বাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে রইলো। ব্রুশ তখন গলায় ঝোলানো মুক্তোর লকেটটা দেখাল। নানা-ভাবে ওদের বোঝাল, এবার ওরা বুঝলো। ভয়ে ওদের মুখ শুকিয়ে গেল। ওরা মাথা ঝাঁকাতে লাগল।

লা ব্রুশ বড় সর্দারকে ডেকে বললো—'এদের মধ্যে চারজনকে বেছে রাখো। কাল সকালে এদের নিয়ে মুক্তোর সমুদ্রে যাবো।'

বড় সর্দার ভাজিম্বাদের শাস্তিঘরে ফিরিয়ে নিয়ে গেল। চারজনকে বেছে নিয়ে আলাদা ঘরে রাখল। যারা রাজা সেনাপতির খোঁজে জঙ্গলে গিয়েছিল, তারা সন্ধেবেলা ফিরে এল। ওরা কারো খোঁজ পায় নি। গভীর অরণ্য ভাজিম্বাদের নখদর্পণে। জঙ্গলের লুকানো জায়গা থেকে ওদের বের করা একরকম অসম্ভব ব্যাপার। একথা বড় সর্দারই লা ব্রুশকে বোঝাল। কোন কথা না ব'লে গুম হ'য়ে ব'সে রইল লা ব্রুশ। শুধু দাড়িতে হাত বুলোতে লাগল।

সন্ধ্যের পর থেকেই লা ব্রুশ ভাজিম্বাদের প্রিয় তোয়কো মদ খেতে লাগল। জলদস্যুরাও তোয়কো খেয়ে রাস্তায় কোন বাড়ির উঠানে, নয়তো গাছের নীচে ফুর্তির চোটে গড়াগড়ি খেতে লাগল। লা ব্রুশ তোয়কোর নেশায় বুঁদ হয়ে কাঠের সিংহাসনের ওপরেই গুটি-শুটি মেরে ঘুমিয়ে পড়ল। নিজেকে ভাবতে লাগল সম্রাট নেপোলিয়ন।

পরের দিন একটু বেলায় লা ব্রুশের ঘুম ভাঙল। বড় সর্দারকে ডেকে বলল 'চারজনকে বেছে রেখেছো?'

বড় সর্দার মাথা ঝুঁকিয়ে বলল, 'হ্যাঁ।

লা ব্রুশ শুনে বলল 'চলো সব, মুক্তোর সমুদ্রে যাবো। এক্ষুণি।'

মুক্তোর সমুদ্রে যাবার পথ ব'লে কিছু নেই। ঘন গভীর জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে গাছের ডাল, ঝোপ কেটে-কেটে পথ ক'রে নিতে হচ্ছে। কত বিচিত্র বর্ণের বিচিত্র আকারের পাখি এই বনে। কত রকমের গাছ-পাখি এই বনে। প্রচুর রেন-ট্রী, র‍্যাফিয়া-রাফা গাছ, পঞ্চাশ-

ষাট ফুট উঁচু। মাথায় পাতাগুলো সুন্দরভাবে ছড়ানো। বিচিত্র রকমের লেমুর, ফোসা, তান্দ্রাকাস প্রাণী। বনের মধ্যে দিয়ে পথ ক'রে-ক'রে ওরা যখন মুক্তোর সমুদ্রের ধারে পৌঁছল, তখন বেশ বেলা হ'য়ে গেছে। মুক্তোর সমুদ্রের জল নীল, নিস্তরঙ্গ। দূরে কাঁচপাহাড় দেখা যাচ্ছে।

যে চারজন ভাজিম্বাকে লা ব্রুশ ধ'রে নিয়ে গিয়েছিল, এবার তাদের জলে নামাবার তোড়জোড় চলল। বড় সর্দার ওদের জলে ঠেলে-ঠেলে শাসাচ্ছে, আর ওরা ভয়ে কাঁপতে-কাঁপতে উঠে আসছে। লা ব্রুশ বলল—'দু'জন-দু'জন করে নামাও। উঠে আসতে চাইলে বর্শা দিয়ে খুঁচিয়ে দাও, তাহ'লেই আর উঠে আসতে সাহস পাবে না।'

তাই করা হলো। লা ব্রুশ চেঁচিয়ে বললো—'ডুব দিয়ে নিচে থেকে মুক্তো এনে দাও, তাহ'লেই তোমাদের ছেড়ে দেবো।' ভাজিম্বারা এতক্ষণে ভালোভাবেই বুঝে ফেলেছে লা ব্রুশ কি চায়। দু'জন ভাজিম্বাকে ঠেলে নামিয়ে দেওয়া হ'ল। একজন উঠে আসতে-আসতে পারের দিকে-এলে বড় সর্দার বর্শার খোঁচা দিতে লাগল। তারপর কেউ তরোয়ালের খোঁচা, কেউ ভাঙা ডালা দিয়ে মাথায় মারতে লাগল। এবার ভাজিম্বা যুবকটি জলে ডুব দিল। অন্যজন যে ডুব দিয়েছিল, সে আর উঠল না। এই যুবকটি মাত্র একবার জলের ওপর মাথা তুলেছিল। তারপর ডুবে গেল। আর উঠলো না। বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর আর দু'জনকে নামানো হ'ল একইভাবে। তরোয়াল বর্শা, আর গাছের ডাল উঁচিয়ে রইল জলদস্যুরা। ওরাও উঠে আসতে সাহস পেল না। একজন ডুব দিলো। ওর দেখাদেখি অন্য মধ্যবয়স্ক ভাজিম্বাটিও ডুব দিল। যে প্রথম ডুব দিয়েছিল সে আর উঠল না। কিন্তু মধ্যবয়স্ক ভাজিম্বাটি উঠল। তাড়াতাড়ি পারের দিকে সাঁতরে আসতে লাগল। জলদস্যুরা চীৎকার ক'রে ওকে উৎসাহ দিতে লাগল। মধ্যবয়স্কটি এসে পারে উঠল। দেখা গেল ওর ডান হাতের মুঠোয় একটা মুক্তো। লোকটা হাঁপাতে লাগল। দেখা গেল ওর সারা গায়ে যেন ছুঁচ বিঁধিয়ে ফুটো করে ক'রে দেওয়া হয়েছে। রক্ত বেরুচ্ছে ফুটো-গুলো দিয়ে। লোকটা বারকয়েক মাথা এপাশ করল। তারপর আস্তে-আস্তে চোখ বন্ধ ক'রে যেন ঘুমিয়ে পড়ল। ওর দিকে তখন কারো খেয়াল নেই। সবাই লা ব্রুশের চারপাশে জড়ো হ'য়ে মুক্তোটা দেখছে। লা ব্রুশের লকেটের চেয়ে এই মুক্তোটা বড়। লা ব্রুশ হাসছে ঘিরে দাঁড়ানো জলদস্যুরাও আনন্দে অধীর হ'য়ে চীৎকার করতে লাগল। কেউ-কেউ নাচতে লাগল। মুক্তো এনেছিল যে মধ্যবয়স্ক ভাজিম্বাটি, সে তখন মারা গেছে।

কয়েকদিন কাটলো। লা ব্রুশের মনে শান্তি নেই। সমস্ত চাঁদের দ্বীপের রাজা এখন ও। মুক্তোর সমুদ্র হাতের কাছে—ওরই অধিকারে। অথচ মুক্তো তোলা যাচ্ছে না। মুক্তোর সমুদ্রে যত মুক্তো আছে, সব চাই ওর। কিন্তু এনে দেবে কে? যে ক'জন ভাজিম্বাকে শাস্তিঘরে রাখা হয়েছে, সব ক'জনই বৃদ্ধ-অথর্ব। তারা মুক্তো আনতে পারবে না। জলদস্যুরা ওর হুকুমে শক্ত সামর্থ্য ভাজিম্বাদের খুঁজে বেড়াচ্ছে। কিন্তু কাউকে ধরতে পারছে না। বনের মধ্যে সব যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে।

ক্রুদ্ধ লা ব্রুশ কখনও কাঠের সিংহাসনে উঠে কাঠের পা নিয়ে লাফাচ্ছে, কখনও বিনা কারণে বড় সর্দারকে যাচ্ছেতাই বলছে, তরোয়াল খুলে জলদস্যুদের তাড়া দিচ্ছে—'যে ক'রে হোক, শক্ত সমর্থদের ভাজিম্বাদের ধ'রে আনো।'

বড় সর্দার, জলদস্যুরা লা ব্রুশের ভয়ে সন্ত্রস্ত।

এদিকে কয়েদ ঘরে ফ্রান্সিসদের একঘেঁয়ে দিন কাটছে। বেন্‌জামিনের কাছে ওরা শুনেছে চাঁদের দ্বীপ এখন লা ব্রুশের কবজায়। রাজা, সেনাপতি সব পালিয়েছে।

সেদিন সকালে খাবার দিতে এলে বেন্‌জামিনকে ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করল—'লা ব্রুশ কবে ক্যারাভেল-এ ফিরবে ?'

—সব মুক্তো না নিয়ে ফিরবে না ক্যাপ্টেন ফিরবে না।

—সে কি এখনও মুক্তো পায় নি ?

—চারজন ভাজিম্বাকে নামিয়েছিল। তিনজন জল থেকে উঠতেই পারে নি। একজন মাত্র একটা মুক্তো এনে দিয়েই ম'রে গেছে। লোকটার সারা গা ফুটো-ফুটো হ'য়ে গিয়েছিল।

ফ্রান্সিস ম্লান হাসল। বললো—'হবেই তো—মুক্তোর সমুদ্রের প্রহরী লাক্ মাছ বড় সাংঘাতিক জীব।'

খাবার দিতে-দিতে বেন্‌জামিন অবাক চোখে ওর দিকে তাকিয়ে বললো—'তুমি জানলে কি ক'রে ?'

'—আমি জানি। ক্যাপ্টেনকে ব'লো আমি মুক্তো এনে দিতে পারি।'

হ্যারি চম্‌কে উঠল। চাপাস্বরে বলল—'কী বলছো যা-তা।'

ফ্রান্সিস ওর দিকে তাকালো। বললে—'হ্যারি আমাদের মুক্তির এ ছাড়া আর কোন পথ নেই।'

—কিন্তু খুনী লা ব্রুশের কি লোভের শেষ আছে ?

—দেখা যাক না। এটাই আমাদের মুক্তির শেষ চেষ্টা। বেন্‌জামিন যখন ফিরে যাচ্ছে, তখন ফ্রান্সিস চেঁচিয়ে বলল—'কথাটা ক্যাপ্টেনকে ব'লো।'

একঘন্টা সময় কাটে নি। বেন্‌জামিন হাঁপাতে-হাঁপাতে কয়েদ ঘরে এসে ঢুকলো। ফ্রান্সিসের কাছে এলো। ওর হাতকড়া খুলতে-খুলতে বলল—'চলো, তোমাকে ক্যাপ্টেন ডেকেছে।'

ফ্রান্সিস উঠতে গেল। হ্যারি ওর হাত চেপে ধরল—'তুমি পাগল হ'য়েছো ?'

ফ্রান্সিস হ্যারির হাতে চাপা দিয়ে ম্লান হাসলো—'যদি আমার প্রাণের বিনিময়ে আমার এতগুলো বন্ধু মুক্তি পায়, তাহ'লে ক্ষতি কি ?'

—'না, তোমাকে যেতে দেব না।' হ্যারির চোখে জল এসে গেল।

'—ছিঃ, হ্যারি, কাঁদছো ? আমরা না ভাইকিং ?' ফ্রান্সিস বলে উঠল। হ্যারি আস্তে-আস্তে ফ্রান্সিসের হাত ছেড়ে দিলো। ফ্রান্সিস বেন্‌জামিনের অলক্ষ্যে একবার কোমরে গোঁজা আয়নাটায় হাত বুলিয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়াল। লোহার দরজার কাছে একবার ঘুরে দাঁড়াল। বললো 'ভাইসব—যদি আমি না ফিরি, তবে হ্যারিকে তোমরা দলনেতা ব'লে মেনে নিও। ও যা বলবে তাই ক'রো।'

কথাটা ব'লে ফ্রান্সিস দ্রুতপায়ে বেরিয়ে গেল। ভাইকিংদের মধ্যে গুঞ্জন উঠল। সবাই হ্যারির মুখে ঘটনাটা শুনল। ওদের মুক্তির বিনিময়ে ফ্রান্সিস তার নিজের জীবনটা বাজি ধ'রেছে। সকলেই হৈ-হৈ ক'রে উঠল—'ফ্রান্সিসকে ফিরিয়ে আনো। ওর জীবনের বিনিময়ে আমরা মুক্তি পেতে চাই না।'

কিন্তু ফ্রান্সিস তখন অনেক দূরে। ও নৌকায় বসে আছে তখন। বেন্‌জামিন নৌকাটা বেয়ে চলেছে সোফালা বন্দরের দিকে। হ্যারি ভাইকিংদের লক্ষ্য করে বললো—'ভাইসব—তোমরা শান্ত হও। শোন—ফ্রান্সিস মুক্তোর সমুদ্রের ভয়াবহ বিপদের কথা সবই জানে। সেই বিপদ থেকে বাঁচবার উপায় ও জানে। শুধু মুক্তোর সমুদ্র থেকে বেরিয়ে আসার রহস্যটা ওর অজানা। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করো যেন এই রহস্যটা ও ভেদ করতে পারে। তাহ'লেই ওর জীবনের কোন আশঙ্কা থাকবে না। সকলেই চুপ ক'রে হ্যারির কথা শুনল! কেউ আর কোন কথা বলল না।

বেন্‌জামিনের পেছনে-পেছনে যখন ফ্রান্সিস কয়েদঘরের বাইরে এসে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগল, তখন চোখে আলো লাগাতে ওর অস্বস্তি হ'তে লাগল। ডেক-এ উঠেই বাইরের উজ্জ্বল আলোর দিকে ও তাকাতে পারল না। চোখ জ্বালা করে বুজে এল। ও দুহাতে চোখ ঢেকে দাঁড়িয়ে পড়ল। বেন্‌জামিন ওর দিকে তাকিয়ে বলল—হঠাৎ বাইরে এলে ও-রকম হয়। একটু পরেই সয়ে যাবে। তাই হলো। আস্তে-আস্তে আলো সহনীয় হয়ে উঠল। ও এবার চোখ থেকে হাত সরিয়ে নিল। বেন্‌জামিনের পেছনে-পেছনে হাঁটতে লাগল।

দু'জনে জাহাজ থেকে নৌকায় নামল। বেনজামিন 'সোফালা' বন্দর লক্ষ্য ক'রে নৌকো চালাতে লাগল।

সমুদ্রতীরে পোঁছে ফ্রান্সিস দেখল, এখানে-ওখানে তখনও ভাজিম্বাদের মৃতদেহ পড়ে আছে। কামানের গোলায় সমুদ্রতীরে কোথাও-কোথাও বড় গর্তের সৃষ্টি হয়েছে। কামানের মুখে ভাজিম্বারা দাঁড়াতে পারে নি। শুধু বর্শা নিয়ে কি কামানের বিরুদ্ধে লড়া যায়।

সোফালা বন্দরের একটা গুদোমঘরও বিধ্বস্ত হ'য়েছে। নির্জন চারদিক। একজন ভাজিম্বাকেও ওরা দেখতে পেল না। বাজারের মত জায়গাটা খাঁ-খাঁ করছে। যে বাড়িগুলো চোখে পড়লো, সেগুলোর দরজা খোলা। কোন-কোন জনপ্রাণী নেই। ফ্রান্সিস যুদ্ধের ভয়াবহতা অনুভব করল। লা ব্রুশের ভয়ে নিশ্চয়ই যারা বেঁচেছিল, তারা বনে-জঙ্গলে আশ্রয় নিয়েছে। এক শ্মশানের রাজা হ'য়ে বসেছে লা ব্রুশ।

ফ্রান্সিসকে নিয়ে বেন্‌জামিন যখন রাজবাড়িতে গিয়ে পৌঁছল, তখন একটু বেলা হ'য়েছে। লা ব্রুশ কাঠের সিংহাসন হাত পা ছাঁড়িয়ে বসেছিল। ফ্রান্সিসকে ঢুকতে দেখেই ও লাফিয়ে উঠল। খুক্-খুক্ ক'রে হাসলো। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বললো—'এসো-এসো, ফ্রান্সিস এসো। সত্যি তোমরা বীরের জাত। মুক্তোর সমুদ্রে নামার কথা শুনে সকলের যখন ভয়ে মুখ শুকিয়ে যাচ্ছে, তখন তুমি নিজে থেকে আগ বাড়িয়ে রাজি হ'য়েছো। এ সোজা কথা? এ্যাঁ? সত্যিই তুমি বীর।'

ফ্রান্সিস এসব কথা ভুলল না। ও প্রথমেই শক্ত ভঙ্গিতে শর্তের কথা তুলল—'আমি মুক্তো এনে দেবো কিন্তু একশর্তে।'

—কি শর্ত?

—আমাকে আর আমার বন্দী বন্ধুদের সঙ্গে-সঙ্গে মুক্তি দিতে হবে। আমাদের জাহাজ ফিরিয়ে দিতে হবে।

—'বেশ তো ভালো কথা। কিন্তু হীরে দু'টো আমার ক্যারাভেল-এ রেখে যেতে হবে।'

ফ্রান্সিস একটু ভাবল। ভেবে দেখল, এ ছাড়া উপায় নেই। হীরে উদ্ধারের কথা পরে ভাববো। বলল—বেশ! এবার আর একটা শর্ত।

—বলো।

—আমি একবার ডুব দেবো। আমার ডান হাতের মুঠোয় যে ক'টা মুক্তো আঁটে, সে ক'টাই পাবেন।

লা ব্রুশ একটু হতাশার ভঙ্গিতে বলল—সে আর ক'টা। বড় জোর তিনটে।

—ঐ তিনটে পেয়েই আপনাকে সন্তুষ্ট থাকতে হবে।

লা ব্রুশ একটুক্ষণ ভেবে দাড়িতে হাত বুলিয়ে তারপর বললো—'বেশ, তাই হবে।'

ফ্রান্সিস একটু হেসে বললো—'অবশ্য আপনার মত খুনে নরঘাতক যে কতটা শর্ত অনুযায়ী চলবেন, তাতে আমার সন্দেহ আছে।'

তাতে বড় সর্দার খোলা তরোয়াল হাতে ছুটে এলো। লা ব্রুশ হাত তুলে ওকে থামিয়ে দিয়ে খুক্-খুক্ ক'রে হেসে বললো—'যাও খেয়ে নাও গে, আমরা এক্ষুণি বেরুবো'।

পাশের ঘরটাকে রসুইখানা করা হ'য়েছে। বড়সর্দারই ফ্রান্সিসকে ওখানে এনে বসালো। লম্বা-লম্বা সুস্বাদু রুটি, প্রচুর মাংস, মাছ এসব খেতে দিল। কয়েদ ঘরে জঘন্য খাদ্য খেয়ে-খেয়ে খিদেটাই যেন ম'রে গেছে। এটাও একটা কারণ, আর একটা কারণ বন্ধুদের শুকনো ক্ষুধার্ত মুখগুলো ভেসে উঠলো চোখের সামনে। ফ্রান্সিস আর খেতে পারলো না। একপাশে খাবার সরিয়ে রেখে উঠে পড়লো। বড় সর্দার হাঁ-হাঁ করে ছুটে এল—'করো কি—করো কি, পেট পুরে খেয়ে নাও। অনেকক্ষণ জলে থাকতে হবে।'

—'আমি আর খাবো না।' ফ্রান্সিস শান্তস্বরে বললো।

* * *

বনের মধ্যে দিয়ে মুক্তোর সমুদ্রের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু হ'ল। প্রায় সব ক'জন জলদস্যুকেই সঙ্গে নেওয়া হ'য়েছে। এটা দেখে ফ্রান্সিস লা ব্রুশকে জিজ্ঞেস করল—'এত লোক কি হবে? আমরা তো যুদ্ধ করতে যাচ্ছি না'।

লা ব্রুশ খুক্-খুক্ ক'রে হাসলো। বললো—'বিপদ-আপদের কথা কি বলা যায়।'

মুক্তোর সমুদ্রের কাছা-কাছি পড়ল অগ্নি-প্রবালের স্তর। সেটা দ্রুতপায়ে পেরোল সবাই। ঠিক দুপুরবেলা ওরা মুক্তোর সমুদ্রের ধারে এসে পৌঁছল। ফ্রান্সিস দেখলো জল শান্ত। হাওয়ায় শিরশির ঢেউ উঠছে। দূরে ঢাকা কাঁচ পাহাড়ের কালো প্রাচীর। ডানদিকে খাড়া উঠে গেছে। প্রকৃতি যেন সুরক্ষিত ক'রে রেখেছে এই মুক্তোর সমুদ্রকে। অবশেষে মুক্তোর সমুদ্র আজ ফ্রান্সিসের চোখের সামনে। কিন্তু বন্ধুরা কেউ দেখতে পেলো না। ফ্রান্সিস মুক্তোর সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে এসব সাতপাঁচ ভাবছে, লা ব্রুশ তাড়া দিল—'কই! নামো শিগ্গির।'

ফ্রান্সিস জলে নামল! তারপর সাঁতরাতে-সাঁতরাতে মাঝখানটায় এসে চারদিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে ডুব দিল। একটু নামতেই দেখল, আলোর উৎসে সেই অপূর্ব সুন্দর মুক্তোগুলো। ফ্রেদারিকো ঠিকই বলেছিল, তলাটা অমসৃণ। তাতে বড়-বড় আকারের ঝিনুক। কোনটার মুখ খোলা, কোনটা বন্ধ। কোনো-কোনো ঝিনুকের খোলা মুখের মধ্যে মুক্তো রয়েছে। জায়গাটা অপরূপ সৌন্দর্য, মানুষের কল্পনাতেও বোধহয়

আসবে না, এমনি অপার্থিব সেই সৌন্দর্য। একটা গভীর বেগুনে নীল আলো জায়গাটাকে আলোকিত ক'রে রেখেছে। হঠাৎ গা ঘেঁষে কি একটা চলে যেতেই ফ্রান্সিস সম্বিত ফিরে পেলো। দেখল, মুক্তোর সমুদ্রের বিভীষিকা, লাফ্ মাছ। পিঠের ছুঁচলো কাঁটাগুলো উঁচিয়ে আছে। বেগুনে নীল আলো লেগে গায়ের আঁশগুলো চক-চক ক'রে উঠলো। ফ্রান্সিস তাড়াতাড়ি কোমরে গোঁজা আয়নাটা বের ক'রে অমসৃণ তলাটায় রেখে দিলো। বেশ জোরালো আলো প্রতিবিম্বিত হ'ল। লাফ্ মাছটাকে ওদিকে দ্রুত যেতে দেখলো। দম ফুরিয়ে এসেছে। ফ্রান্সিস জল ঠেলে উপরে ভেসে উঠলো। ওদিকে ভেসে উঠতে দেখে জলদস্যুরা হৈ-হৈ করে উঠলো। লা ব্রুশের মুখেও হাসি।

ফ্রান্সিস আবার ডুব দিলো। এক ডুবে সোজা নীচে নেমে এলো। ছড়িয়ে থাকা মুক্তো থেকে তিনটে মুক্তো তুললো। তখনই লক্ষ্য করলো অনেক ক'টা লাফ্ মাছ আয়না-টার কাছে জড়ো হয়েছে। কয়েকটা মাছ আয়নাটায় ঢুঁ দিয়ে যাচ্ছে। ঐ জায়গায় জলটা রক্তে লাল হয়ে উঠেছে। মাছগুলোর মুখ নিশ্চয়ই ফেটে গিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে। ফ্রান্সিস পায়ে জলের ধাক্কা দিয়ে ওপরে উঠে এল। জলদস্যুরা ওকে জীবিত দেখে আবার চীৎকার ক'রে উঠল। ফ্রান্সিস সাঁতরাতে-সাঁতরাতে তীরে এসে উঠল। লা ব্রুশ খোঁড়াতে খোঁড়াতে ছুটে এলো। ফ্রান্সিস জল থেকে উঠতে যাবে, লা ব্রুশ ছুটে এসে বললো—'উঠো না—উঠো না—আর তিনটে দাও।'

ফ্রান্সিস কঠোর দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকালো। বললো—'এক মুঠোয় যে ক'টা আঁটে তাই এনেছি, দু'বার নামবার তো কথা ছিল না।'

লা ব্রুশ খুক্-খুক্ ক'রে হাসলো—'আর তিনটে ব্যাস্।'

ফ্রান্সিস বুঝল, যুক্তি শোনার মানুষ নয় লা ব্রুশ। আর তিনটে মুক্তো পেলে যদি সন্তুষ্ট হয়, তাহ'লে সেটা এখনই দেওয়া সম্ভব। কারণ লাফ্ মাছগুলো এখন আয়নাটায় ঢুঁ দিতে ব্যস্ত।

ফ্রান্সিস আবার সাঁতরে মাঝখানের দিকে চলল। লা ব্রুশ বড় সর্দারকে ইশারায় ডাকল। ফিস-ফিস করে বললো—সবাইকে তীর বরাবর ছড়িয়ে দাঁড়াতে বলো। ও যেন কিছুতেই উঠে না আসতে পারে। যত মুক্তো আছে, সবই আমার চাই।'

বড় সর্দার ঘুরে দাঁড়িয়ে সবাইকে তাই বললো। তীর বরাবর সবাই তরোয়াল আর বর্শা হাতে দাঁড়িয়ে পড়লো। ফ্রান্সিসের আর তীরে উঠে আসার উপায় রইলো না।

ফ্রান্সিস মাঝখানটায় এসে ডুব দিল। ফ্রেদারিকো ঠিকই বলে ছিল। গভীরতা বেশি নয়। খুব তাড়াতাড়ি তলায় পেঁৗছে গেল। আর তিনটে মুক্তো তুলতে পারলেই মুক্তি আমাদের সকলের। কিন্তু এ কি? ফ্রান্সিসের মাথাটা ঘুরে উঠলো। আয়নায় আলোর প্রতিফলন তো দেখা যাচ্ছে না! কোথায় গেল আয়নাটা? হয়তো উলটে গেছে। আর এক মুহূর্ত দেরি করা চলবে না। ফ্রান্সিস সঙ্গে-সঙ্গে হাতে-পায়ে জল ঠেলে, জলে কয়েকটা ধাক্কা দিয়ে ওপরে ভেসে উঠলো। তীরের দিকে সাঁতরাতে যাবে, তখনি দেখলো সারা তীর জুড়ে জলদস্যুরা তরোয়াল, বর্শাহাতে দাঁড়িয়ে। ওকে ভেসে উঠতে দেখে সবাই অস্ত্র উঁচিয়ে হৈ-হৈ ক'রে উঠল। শয়তান লা ব্রুশ! তোমার মতলব আমার কাছে পরিস্কার! ফ্রান্সিস মনে-মনে বলল। তারপর এক মুহূর্ত দেরি না ক'রে প্রাণপণে

কাঁচ পাহাড়ের দিকে সাঁতার কাটতে লাগল। ফ্রেদারিকো একটা সুড়ঙ্গমত পথ পেয়েছিল সেটা কোথায়? এই রহস্যটুকু ভেদ করার মধ্যে ওর জীবন-মৃত্যু নির্ভর করছে। ও কাঁচপাহাড়ের দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে সাঁতার কাটতে লাগল। হঠাৎ বিদ্যুত তরঙ্গের মত একটা চিন্তা ওকে নাড়া দিয়ে গেল। ঐ যে কাঁচ পাহাড়ের সবচেয়ে উঁচু মাথাটা, ওটা বাঁদিকে কাত হ'য়ে ভাঙা কাঁচের মত উঁচিয়ে ছুঁচোলো হ'য়ে আছে না? ফ্রেদারিকোর আয়নাটাও সোজা করে ধরলে ঠিক এমনি—বাঁকা ছুঁচলো একটা দিক ছিল। গলায় ঝোলাবার দড়ি পরাবার জন্যে ঠিক ছুঁচলো মাথার নীচে বরাবর ছিল ফুটোটা কি শুধু দড়ি পরাবার জন্যে ছিল? না—না—ভীষণ ভাবে চমকে উঠে ফ্রান্সিস প্রায় চীৎকার ক'রে উঠলো—ওটাই সুড়ঙ্গপথের ইঙ্গিত। আর এক মুহূর্ত দেরী নয়। শেষ রহস্যের সমাধান হ'য়ে গেছে।

শরীরের সমস্ত শক্তি একত্র ক'রে ফ্রান্সিস কাঁচপাহাড়ের চূড়ো লক্ষ্য ক'রে সাঁতার কাটতে লাগল। একটু পরেই নীচে একটা জলের টান অনুভব করল। আর একটু এগোতেই প্রচণ্ড জলের টানে ও তলিয়ে গেল। কিছু স্পষ্ট চোখে পড়ছে না। শুধু দেখলো, একটা অন্ধকার গহবরের মধ্যে দিয়ে ও প্রচণ্ড বেগে ছুটে চলেছে জলের টানের সঙ্গে-সঙ্গে। হঠাৎ অন্ধকার কেটে গেল। এখানে আলো আছে। জলের টান আর নেই। হাতে-পায়ে জল ঠেলে ফ্রান্সিস ওপরে ভেসে উঠলো। পেছনে তাকিয়ে দেখলো, কাঁচপাহাড় টানা চলেছে সোফালা বন্দরের দিকে। সামনে অসীম সমুদ্র। আঃ—মুক্তির উল্লাসে ও জলের মধ্যে দু'টো পাক খেল।

ফ্রান্সিস গা ছেড়ে দিয়ে কিছুক্ষণ দম নিলো। তারপর আস্তে-আস্তে সাঁতার কেটে চলল সোফালা বন্দরের দিকে।

সোফালা বন্দরের কাছাকাছি এসে একটা পাথরের আড়ালে ও হাঁপাতে লাগল। পশ্চিম দিকে তাকিয়ে দেখল সূর্য অস্ত যেতে দেরি আছে। দূরে লা ব্রুশের ক্যারাভেল আর ওদের জাহাজটা দাঁড়িয়ে আছে। আকাশ, সমুদ্রতীরের দিকে সামুদ্রিক পাখিগুলো উড়ে বেড়াচ্ছে, আর তীক্ষ্নস্বরে ডাকছে। ও বিমুগ্ধ চোখে তাকিয়ে মুক্ত প্রকৃতির রূপ দেখতে লাগল। কতদিন এই আকাশ, মাটি, পাখি, সমুদ্র দেখি নি। কতদিন? হঠাৎ হ্যারি আর অন্য বন্ধুদের বন্দী জীবনের কথা মনে পড়তে ওর মনটা খারাপ হ'য়ে গেল।

পশ্চিমদিকের আকাশে আর সমুদ্রে গভীর লাল রং ছড়িয়ে সূর্য অস্ত গেল। কিন্তু তখনই অন্ধকার নেমে এল না। চারিদিকে অন্ধকার নেমে আসার জন্যে ফ্রান্সিসকে বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো।

রাত্রি নেমে আসতেই ফ্রান্সিস ওদের জাহাজটার দিকে সাঁতরে চলল। জাহাজের কাছে পৌঁছে ও নোঙর বাঁধা মোটা কাছিটা বেয়ে-বেয়ে জাহাজের ডেক-এ উঠে এল। লা ব্রুশ এই জাহাজে কোন পাহারাদার রাখে নি। ওকে আর লুকিয়ে কেবিনঘরে আসতে হলো না। কেবিনঘরে আসার সময় ও আড়াল থেকে উঁকি দিয়ে দেখল, ক্যারাভেল-এ দু'জন পাহারাদার জলদস্যু ঘুরে বেড়াচ্ছে। ও ভেবে নিশ্চিন্ত হলো যে ওদের জাহাজটা অন্ততঃ নিরাপদ। এখানে নির্বিবাদে আশ্রয় নেয়া চলবে।

নিজের কেবিনে ঢুকে ফ্রান্সিস ভেজা জামাকাপড় ছাড়ল। ভীষণ খিদে পেয়েছে। কিছু খেতে হয়। রসুইঘরে গিয়ে ঢুকল। উনুন ধরিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যে গরম-গরম রুটি আর সুপ তৈরি করল। পেট ভ'রে খেয়ে কেবিনঘরে ফিরে এসে শুয়ে পড়ল। অনেক চিন্তা মাথায়। কি ক'রে বন্ধুদের মুক্তি করা যাবে? কি ক'রে হীরেসুদ্ধু জাহাজটা নিয়ে পালানো যাবে? ও যে মুক্তি পেয়েছে, এটা বন্ধুদের জানানো প্রয়োজন। কিন্তু কি ক'রে জানাবে?

দু'তিনদিন কেটে গেল। ফ্রান্সিস ওদের জাহাজেই লুকিয়ে রয়েছে। খায়-দায় আর ভাবে, কি ক'রে বন্ধুদের মুক্ত করা যায়। ওদিকে লা ব্রুশ-এর ক্যারাভেল-এ যথেষ্ট সংখ্যক জলদস্যুরা রয়েছে, ওদের দৃষ্টি এড়িয়ে বন্ধুদের মুক্ত করা অসম্ভব। ফ্রান্সিস সুযোগের প্রতীক্ষায় রইল।

ওদিকে বড় সর্দার কয়েকজন জলদস্যুকে নিয়ে পলাতক ভাজিম্বাদের খোঁজে বন-জঙ্গল তোলপাড় করছিল। রাজা, মন্ত্রী, সেনাপতি তো দূরের কথা কোনো সাধারণ ভাজিম্বা যোদ্ধাকেও ওরা খুঁজে বের করতে পারল না।

একদিন বিকেলের দিকে পাহাড়ী এলাকায় বড় সর্দার দলবল নিয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে, হঠাৎ একটা পাথরের আড়াল থেকে একটা বর্শা ছুটে এসে বড় সর্দারের পিঠে বিঁধে গেল। বড় সর্দার উবু হ'য়ে পাথরের ওপর পড়ে গেল। বর্শাটা পিঠ ভেদ ক'রে বুক পর্যন্ত চলে এসেছে। বড় সর্দার মাটিতে পড়ে কাতরাতে লাগল। দু'তিনজন জলদস্যু মিলে বর্শাটা খুলে ফেলল। ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ছুটল। আহত বড় সর্দারকে কাঁধে নিয়ে ওরা রাজ-বাড়িতে নিয়ে আসার পথে বড় সর্দার মারা গেল। বড় সর্দারের সঙ্গীরা অবশ্য যে পাথরের আড়াল থেকে বর্শাটা ছুটে এসেছিল, সেখানে তন্ন-তন্ন ক'রে খুঁজল, কিন্তু কারোর দেখা পেল না। ওদের মনে বেশ ভয়ও ঢুকেছিল। আবার কখন কোন পাথরের আড়াল থেকে বর্শা ছুটে আসে। ওরা সন্ধ্যে হবার আগেই ঐ তল্লাট ছেড়ে চলে এল।

লা ব্রুশ মৃত সর্দারের মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। তারপর চেঁচিয়ে হুকুম দিল—'ক্যারাভেল'-এ যত লোক আছে, সবাইকে এখানে জড়ো কর। ক্যারাভেল-এ শুধু বেন্‌জামিন থাকবে, পাহারা দেবে। আর গোলাঘর পাহারা দেবার জন্য দু'জন থাকবে। আর কাল সকালেই পাহাড়ী এলাকার দিকে তল্লাসীতে বেরুবে। কোন ভাজিম্বাকে দেখলেই হত্যা করবে।

লা ব্রুশ ছোট সর্দারকে বড় সর্দারের দায়িত্ব দিল। এই সর্দার ছিল একটু রোগা-ঢ্যাঙা। সে পরদিন সকালেই নৌকো চড়ে ক্যারাভেল-এ এলো। ভাজিম্বাদের নৌকো ক'রে সবাইকে দ্বীপে নিয়ে এল। তারপর রাজবাড়িতে এনে জড়ো করল। ক্যারাভেল-এ রইল শুধু বেন্‌জামিন। আর দু'জন গোলাঘর পাহারাদার।

সব জলদস্যু বড় সর্দারের নেতৃত্বে খোলা তরোয়াল হাতে বন-জঙ্গল চষে ফেলল। কোন ভাজিম্বাকেই ধরতে পারল না। দুপুরের পরে শুরু করল, পাহাড়ী এলাকায় তল্লাসী। একজন ভাজিম্বা পাথরের আড়াল থেকে পালাতে গিয়ে ওদের নজর পড়ে গেল। বড় সর্দার সবার আগে তরোয়াল উঁচিয়ে ছুটল ভাজিম্বা যুবকটিকে ধরতে। কিন্তু বেগতিক বুঝে ভাজিম্বা যুবকটি উঁচু খাড়া পাহাড় থেকে মুক্তোর সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সাঁত্‌রে চললো

পারের দিকে। কিছুদূর সাঁতরাবার পর যুবকটি হঠাৎ হাত-পা ছেড়ে আস্তে-আস্তে জলে ডুবে গেল, আর উঠল না।

খাড়া পাহাড়ের ধারে দাঁড়িয়ে জলদস্যুরা এসব দেখছে। তখনই পেছনে পাথর আর একটা বর্শা তীব্র বেগে ছুটে এল। লাগল একটি জলদস্যুর মাথায়। সে তাল সামলাতে না পেরে খাড়া পাহাড়ের গা বেয়ে গড়িয়ে-গড়িয়ে নীচে মুক্তোর সমুদ্রে এসে পড়ল। বারকয়েক সাঁতরাবার ব্যর্থ চেষ্টা ক'রে সেও জলের নীচে তলিয়ে গেল।

সন্ধ্যে হবার আগেই জলদস্যুর দল রাজবাড়িতে ফিরে এল।

লা ব্রুশ হাত-পা ছড়িয়ে কাঠের সিংহাসনে বসেছিল। পাশেই শেকলে বাঁধা চিতাবাঘের বাচ্চাটা। ঢ্যাঙা সর্দারের মুখে সব শুনে লা ব্রুশের গম্ভীর মুখ আরো গম্ভীর হলো। সে হাতীর দাঁতে বাঁধানো তরোয়ালের হাতলটায় অস্থিরভাবে হাত বুলোতে লাগল।

নিজের জাহাজের মাস্তুলের আড়ালে লুকিয়ে ফ্রান্সিস সবই দেখলো। জলদস্যুরা সব দল বেঁধে চাঁদের দ্বীপে চ'লে গেল কেন, বুঝল না। তবে এটা বুঝল যে, ওখানে নিশ্চয়ই কোন গণ্ডগোল হ'য়েছে, যে জন্যে সবাইকে তলব করা হ'য়েছে। তাহ'লে বোধহয় শুধু বেন্‌জামিন ক্যারাভেল-এর পাহারায় রইল। কারণ ঐ দলে ও বেন্‌জামিনকে দেখে নি।

সেদিন সন্ধ্যে হ'তেই বাতাস পড়ে গেল। আকাশের দক্ষিণ-পূর্ব কোন্ থেকে মেঘ উঠে আসছে, এটা ফ্রান্সিস লক্ষ্য করে নি। ও কেবিন ঘরে পায়চারি করছিল আর ভাবছিল, এই সুযোগ হাতছাড়া করা চলবে না। বন্ধুদের মুক্ত করতে হ'লে এই সুযোগ। বেন্‌জামিন একা। ও হয়তো বাধা নাও দিতে পারে। ও ফ্রেদারিকোকে ভালবাসত। ওর কথা শুনত। সেই সূত্রে ফ্রান্সিসদের সঙ্গে ও ভালো ব্যবহার করত। মাঝে-মাঝে যে দুর্ব্যবহার না ক'রেছে তা নয়, তবে তার জন্যে ওকে দোষ দেওয়া যায় না। লা ব্রুশের হুকুমেই এ'রকম ব্যবহার করতে বাধ্য হ'য়েছে। বেন্‌জামিন বাধা হ'য়ে দাঁড়াবে না। তাই যদি হয়, তাহ'লে বন্ধুদের মুক্ত করতে কোনো অসুবিধেই নেই।

একটু রাত বাড়তেই হঠাৎ হাওয়ার প্রবল ঝাপটায় জাহাজটা যেন কেঁপে উঠল। শুরু হ'ল প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টি। অন্ধকার সমুদ্র ভয়াবহ রূপ নিল। আকাশে মুহুর্মুহু বিদ্যুৎ চমকাতে লাগল। সঙ্গে বাজপড়ার গম্ভীর শব্দ। ফ্রান্সিস খুশির চোটে দু'বার বিছানায় গড়াগড়ি খেয়ে নিল। যে সুযোগের আশায় ও দিন গুণেছে, সেই সুযোগ আজ উপস্থিত। ও তাড়াতাড়ি কিছু খেয়ে নিয়ে। পোষাক পাল্টাল। কোমরে তরোয়াল গুঁজল। তারপর ওপরে ডেকে উঠে এল। জাহাজটা ভীষণ দুলছে। সেই সঙ্গে ঝড়ো বাতাসের ঝাপটা আর বৃষ্টির অবিরল ধারা। ও টাল সামলাতে-সামলাতে চললো জাহাজের মাথার দিকে। এই মাথার দিকেই ক্যারাভেলের সঙ্গে জাহাজটাকে বাঁধা হয়েছে। ফ্রান্সিস জাহাজের মাথায় পা ঝুলিয়ে ধরল। তারপর কাছিটার হাত দিয়ে ধ'রে-ধ'রে ক্যারাভেল-এর ওপর উঠে এল। ডেক-এ কেউ নেই। নিচে কেবিনটায় নামবার সিঁড়ির মুখে একটা কাঁচঢাকা আলো ঝড়ো ঝাপটায় দোল খাচ্ছে। ও পায়ে টাল সামলে ডেক পেরোল। নিচে নামবার সিঁড়ির কাছে এলো। তারপর সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে চললো। কয়েকটা আলো ঝুলছে বটে, কিন্তু তাতে অন্ধকার কাটে নি। সারা গা জলে ভিজে গেছে, যেন স্নান ক'রে উঠেছে। নামতে-নামতে ও কয়েদঘরের কাছে চ'লে এল। কয়েদঘরের

সামনে মাথার কাছে যে আলো জ্বলছে, সেই আলোয় দেখলো, খোলা তলোয়ার হাতে বেন্‌জামিন দরজার সামনে পাহারা দিচ্ছে। বাতিটা ও ক্যারাভেল দুলছে, সেই সঙ্গে কাঠে ক্যাঁচ্-ক্যাঁচ শব্দ উঠছে। ও দেখলো, বেন্‌জামিন একা। অন্য কোন পাহারাদার নেই।

ফ্রান্সিস কয়েক পা এগিয়ে ডাকল—'বেন্‌জামিন।'

বেন্‌জামিন প্রথম ডাকটা শুনতে পেল না। ফ্রান্সিস আর একটু গলা চড়িয়ে ডাকল '—বেনজামিন।'

এবারের ডাকটা কানে গেল। বেন্‌জামিন দ্রুত ঘুরে দাঁড়াল। ঐ স্বল্প আলোয় ও ফ্রান্সিসকে চিনতে পারল না। ফ্রান্সিস আলোর দিকে এগিয়ে এলো, এবার ফ্রান্সিসকে চিনতে পেরে ও বিস্ময়ে হতবাক হ'য়ে গেল। ফ্রান্সিস! মুক্তোর সমুদ্র থেকে বেঁচে ফিরে এসেছে। কিন্তু এক মুহূর্তমাত্র, তারপরই বেন্‌জামিন সতর্কদৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞাসা করল—'এখানে কি চাও?'

ফ্রান্সিস হাসল। বললো—'আমার বন্ধুদের মুক্তি।'

—আমার হাতে তরোয়াল থাকতে সেটি হবে না।

ফ্রান্সিস ওর কাছ থেকে এই ব্যবহার আশা করে নি। বললো—'বেন্‌জামিন, তুমি আমাদের শত্রু। তবু বিশেষ ক'রে তোমাকে শত্রু ব'লে কখনও ভাবি নি। আমি তোমার দিকে বন্ধুত্বের হাত বাড়াচ্ছি'।

কথাটা ব'লে ফ্রান্সিস হাত বাড়াল। বললো—'তুমি সাহায্য করো।'

—'না।' বেন্‌জামিন রুখে দাঁড়াল—'লা ব্রুশের নুন খেয়ে আমি বেইমানি করতে পারবো না।'

ফ্রান্সিস বুঝে উঠতে পারল না কি করবে। বেন্‌জামিন এভাবে রুখে দাঁড়াবে ও স্বপ্নেও ভাবে নি। বললো—কিন্তু আমি তোমার সঙ্গে লড়বো না।

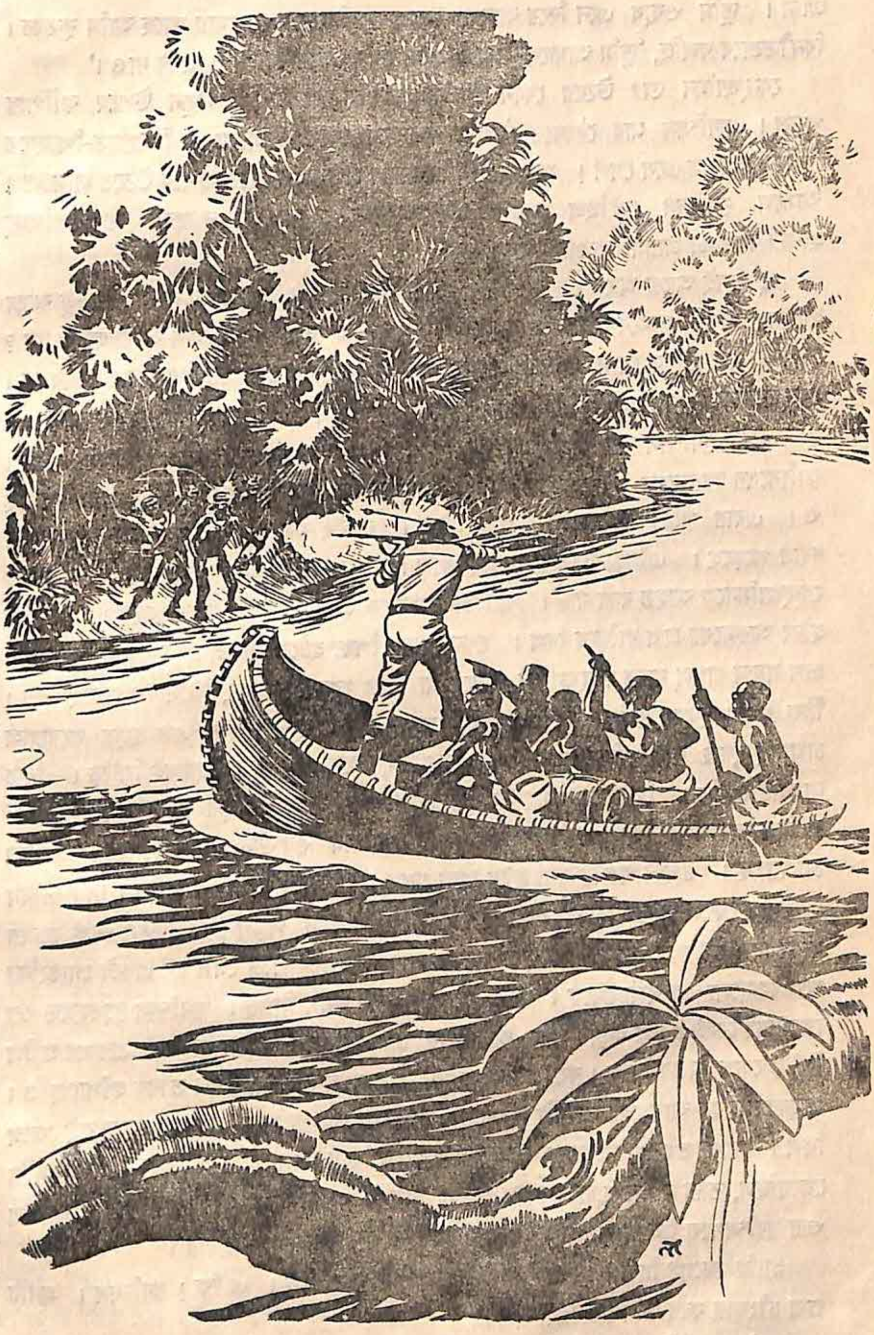
—'কাপুরুষ।' বেন্‌জামিন তাচ্ছিল্যের সঙ্গে মন্তব্য করল।

ফ্রান্সিসের চোখ দু'টো রাগে জ্বলে উঠল। পরক্ষণেই ও শান্তস্বরে বললো—'বেন্‌জামিন আমি মিনতি করছি, আমার কাজ আমাকে করতে দাও।'

—'না।' কথাটা শেষ করাই বেন্‌জামিন তরোয়াল উঁচিয়ে এগিয়ে এল। কোমর থেকে তরোয়াল খুলে ফ্রান্সিস বললো—'তুমি আমাকে লড়াইয়ে নামতে বাধ্য করলে।'

বেন্‌জামিন তরোয়াল হাতে ঝাঁপিয়ে পড়ল ফ্রান্সিসের ওপর। ফ্রান্সিস খুব সহজে মার ঠেকাল বেন্‌জামিন দ্রুতহাতে তরোয়াল চালাতে লাগলো। ফ্রান্সিস শুধু তরো-য়ালের ঘা ঠেকাতে লাগলো আর আত্মরক্ষা করতে লাগলো শুধু।

তরোয়াল যুদ্ধ চললো। জাহাজের দুলুনির মধ্যে দু'জনের পক্ষেই পা ঠিক রাখা কঠিন হয়ে দাঁড়াল। তবু ঐ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেই লড়াই চললো। দু'জনেই হাঁপাতে লাগলো। এটা ঠিক যে ফ্রান্সিসের তরোয়ালের মারের মোকাবিলা বেন্‌জামিনকে করতে হচ্ছে না। ফ্রান্সিস শুধু আত্মরক্ষাই করে চলেছে। বেন্‌জামিনের মার ঠেকাচ্ছে, কিন্তু ফিরে আক্রমণ করছে না। এতে বেন্‌জামিনেরই পরিশ্রম হচ্ছিল বেশি। ফ্রান্সিস সে তুলনায় কম ক্লান্ত হলো। এক সময় তরোয়াল চালানো বন্ধ ক'রে বেন্‌জামিন দাঁড়িয়ে পড়ল। হাঁপাতে লাগলো। ফ্রান্সিস বললো—'বেন্‌জামিন তোমাকে আমরা বন্ধু ব'লেই



শুরু হলো সম্মুখ যুদ্ধ

জানি। তুমি ওষুধ এনে দিয়ে আমাকে সুস্থ করেছিলে। তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। বিনীতভাবে বলছি, 'তুমি আমাকে বাধা দিও না। আমাকে চাবির গোছাটা দাও।'

বেন্‌জামিন তার উত্তরে কোন কথা না ব'লে ফ্রান্সিসের ওপর নতুন উদ্যমে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ফ্রান্সিস মার ঠেকাতে-ঠেকাতে পিছিয়ে যেতে লাগলো। পিছোতে-পিছোতে সিঁড়ির গোড়ায় এসে গেল! বেন্‌জামিন তরোয়াল চালাতে-চালাতে ওপরে উঠতে লাগলো। আসলে ফ্রান্সিস চাইছিল ডেক-এ উঠে আসতে। তাহ'লে নড়াচড়া করবার পিছু হটবার অনেকটা জায়গা পাওয়া যাবে।

দু'জনেই আস্তে-আস্তে ডেক-এ উঠে এল। বাইরে বৃষ্টি কমেছে তখন। কিন্তু ঝড়ো হাওয়ার দাপট সমানে চলেছে। ফ্রান্সিস ভাবল—এ ভাবে ও কতক্ষণ আত্মরক্ষা করবে? বোঝাই যাচ্ছে, সুযোগ পেলেই বেন্‌জামিন ওকে আঘাত করতে দ্বিধাবোধ করবে না। বেন্‌জামিনকে রোখবার একটাই রাস্তা, ওকে আহত করা। এ ছাড়া উপায় নেই কোন।

এবার ফ্রান্সিস আর পিছু না হটে রুখে দাঁড়াল। বেন্‌জামিনকে আক্রমণ করল। ফ্রান্সিসের আক্রমণের নিপুণ ভঙ্গী দেখে বেন্‌জামিন বুঝল, শক্ত লোকের পাল্লায় পড়েছে ও। এবার সত্যিকারের লড়াই শুরু হলো। কেউই কম যায় না। দু'জনেরই ঘন-ঘন শ্বাস পড়েছে। এগিয়ে-পিছিয়ে লড়াই চলল। ফ্রান্সিস সুযোগ খুঁজতে লাগল কি ক'রে বেন্‌জামিনকে আহত করা যায়। ওর ডানহাতটাকে অকেজো ক'রে দিতে হবে। ফ্রান্সিস হঠাৎ আক্রমণের চাপ বাড়িয়ে দিল। বেন্‌জামিন পিছু হটতে লাগল। ফ্রান্সিস আক্রমণের চাপ সমান রাখল যাতে বেন্‌জামিন বুঝতে না পারে, কোথায় যাচ্ছে, কিসে পা পড়ছে ওর। ঠিক এ সময়ই বেন্‌জামিন সিঁড়ির মুখে চলে এসেছে। ফ্রান্সিস এত দ্রুত তরোয়াল চালাচ্ছিল, যে বেন্‌জামিন বুঝতেও পারে নি, আর এক পা পিছোলেই সিঁড়ি। নিচে নামবার সিঁড়ি। পিছোতে গিয়ে বেন্‌জামিনের পা নিচে সিঁড়ির খাঁজে পড়ে গেল। ও টাল সামলাল, কিন্তু ফ্রান্সিস ততক্ষণে বিদ্যুৎবেগে ওর ডান হাত লক্ষ্য করে তরোয়াল চালিয়েছে। একটা গভীর ক্ষত হ'য়ে গেল হাতে। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটল। বেন্‌জামিন তরোয়াল ফেলে দিয়ে আহত হাতটা বাঁ হাতে চেপে ব'সে পড়ল। ফ্রান্সিস ওকে জোরে ধাক্কা দিল। বেন্‌জামিন উলটে ডেকের ওপর চিত হয়ে পড়ে গেল। একটা গোঙানির শব্দ বেরুলো ওর গলা থেকে। ও তখন মুখ দিয়ে শ্বাস নিচ্ছে। ফ্রান্সিস দ্রুতহাতে ওর কোমরের বেল্ট-এ এর কড়ার সঙ্গে আটকানো চাবির গোছাটা খুলে নিল। তারপর ছুটল সিঁড়ি বেয়ে নিচের দিকে। কয়েদঘরের সামনে এসে যখন দাঁড়াল, তখন ভীষণ হাঁপাচ্ছে ও। তাড়াতাড়ি বড় আকারের তালাটা খুলে ফেলল। ভেতরে-ফ্রান্সিসের বন্ধুরা অনেকেই জেগে ছিল। কারণ, তখনও রাতের খাওয়া হয়নি। বাকিরা শুয়ে-বসে-ঘুমিয়ে ছিল। যারা জেগেছিল, তারা দরজা খুলতে দেখে ভাবল, রাতের খাবার আসছে। সেই প্রায় অন্ধকারে ওরা ফ্রান্সিসকে চিনতে পারল না। ফ্রান্সিস চাপাস্বরে ডাকল—'হ্যারি।'

হ্যারি জেগেই ছিল। ও চমকে ফ্রান্সিসের দিকে তাকাল। এ কি! ফ্রান্সিস। হ্যারি প্রায় চীৎকার করে উঠলো—'ফ্রান্সিস।'

ফ্রান্সিস ছুটে এসে হ্যারিকে জড়িয়ে ধরল। আনন্দে হ্যারির চোখে জল এসে গেল। হ্যারিকে ছেড়ে দিয়ে ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল। বললো—'ভাইসব, আর এক মুহূর্ত

দেরি নয়। আমাদের এক্ষুণি পালাতে হবে। কিন্তু কোন শব্দ নয়। আনন্দ-উল্লাসের সময় পরে পাওয়া যাবে।' যারা জেগেছিল, তারা ঘুমন্ত আর তন্দ্রাচ্ছন্নদের ঠেলা দিয়ে বলল, 'এই ওঠ, ফ্রান্সিস এসেছে।'

সকলেই উঠে বসল, কেউ-কেউ দাঁড়িয়ে পড়ল। ফ্রান্সিস গোছা থেকে চাবি বের ক'রে সবাইকে একে-একে মুক্ত করল। বললো—'আস্তে-আস্তে সিঁড়ি দিয়ে উঠে সবাই কাছি বেয়ে-বেয়ে আমাদের জাহাজে চলে যাও। কোনরকম শব্দ ক'রো না।'

সবাই সিঁড়ি বেয়ে উঠে চলে গেল। হ্যারিকে সঙ্গে নিয়ে ফ্রান্সিস সবার শেষে ডেক-এ এল। দেখলো, বেন্‌জামিন তখনও শুয়ে আছে। তবে গোঙাচ্ছে না। হ্যারি বলে উঠল—'এ যে বেন্‌জামিন। এত রক্ত, ও কি মারা গেছে?'

'—না।' ফ্রান্সিস বলল—ওর গায়ে তরোয়াল না চালিয়ে উপায় ছিল না। ফ্রান্সিস নিচু হয়ে বসল। বললো—'হ্যারি—দু'একজনকে ডাকোতো। বেন্‌জামিনকে আমার কাঁধে তুলে দাও।'

দু'চারজন তখনও ওখানে দাঁড়িয়ে আহত বেন্‌জামিনকে দেখছিল। দু'জন এগিয়ে এল। হ্যারিও এসে হাত লাগাল। ওরা বেন্‌জামিনকে ধরাধরি করে ফ্রান্সিসের কাঁধে চাপিয়ে দিল। বেন্‌জামিন আবার গোঙাতে শুরু করল। অত ভারী শরীরটা বয়ে নিয়ে যেতে ফ্রান্সিসের বেশ কষ্ট হচ্ছিল। কিন্তু ও দাঁত চেপে শরীরটাকে বয়ে নিয়ে চলল। কাছিটার কাছে এসে পা বাড়িয়ে আস্তে-আস্তে কাছিটায় ঝুলে পড়বার সময় বলল—'বেন্‌জামিন, বাঁ হাতে শক্ত করে আমাকে ধরে থাকো।'

বেন্‌জামিন তাই করল। ঝড়ো বাতাসে দু'টো জাহাজই দুলছে। ওরই মধ্যে দড়ি বেয়ে-বেয়ে ফ্রান্সিস ওকে ওদের জাহাজের মুখের কাছে নিয়ে এল। হাঁপাতে-হাঁপাতে বললো—'বেন্‌জামিনকে ধরো। ওকে নিয়ে গিয়ে ওষুধ-টষুধ দাও। আমি আস্‌ছি।'

দু'চারজন ভাইকিং বেন্‌জামিনকে ধ'রে তুলে নিল। ফ্রান্সিস দড়ি ধ'রে-ধ'রে আবার ক্যারাভেল-এ ফিরে এল। দেখল—হ্যারি আর আরো কয়েকজন ভাইকিং দাঁড়িয়ে। ফ্রান্সিস বলল—'হ্যারি, শিগগির আমাদের জাহাজে চ'লে যাও। আমি একটু পরেই আসছি'।

ওরা চলে গেল। ফ্রান্সিস সিঁড়ি দিয়ে নেমে ছুটলো গোলাঘরের দিকে। গোলাঘরের সামনে পৌঁছে দেখলো দু'জন পাহারাদার গোলাঘর পাহারা দিচ্ছে। এত যে ব্যাপার ঘটে গেছে, তা ওরা কিছুই জানে না। ফ্রান্সিস বুঝল, ঝড়বৃষ্টির শব্দের জন্যেই ওরা কোন শব্দ পায় নি।

ও চারদিকে তাকাতে লাগল। দেখল গোলাঘরে ঢোকার দরজার ডানদিকে অনেকগুলো কাঠের পাটাতন সাজিয়ে রাখা। ওগুলোর পেছনটা ফাঁকা। ঘুরঘুট্টি অন্ধকার ওখানে। ফ্রান্সিস পায়ের কাছে পড়ে থাকা একটা কাঠের টুকরো ঐ অন্ধকার জায়গাটা লক্ষ্য ক'রে ছুড়ল। কাঠের টুকরোটা সশব্দে ঐ জায়গাটায় পড়লো। দু'জন পাহারাদারই দাঁড়িয়ে পড়ল। তার মধ্যে একজন তরোয়াল উঁচিয়ে পা টিপে-টিপে ঐ অন্ধকার জায়গাটায় গিয়ে ঢুকল। কাঠের জড়োকরা পাটাতনের আড়ালে পড়ে গেল ও। ফ্রান্সিস দ্রুতপায়ে ছুটে এসে অন্য পাহারাদারটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। লোকটা কিছু বোঝবার আগেই ওর হাত থেকে তরোয়াল ছিটকে পেল। লোকটা চিত্‌ হ'য়ে পড়ে গেল। ফ্রান্সিস



এক মুহূর্ত দেরি না ক'রে ওর বুকে তরোয়ালটা ঢুকিয়ে দিল। মনে-মনে বলল—অনেক নিরীহ মানুষকে হত্যা করেছ তোমরা। তোমাদের ওপর দয়া দেখানো অর্থহীন। ও দ্রুতহাতে লোকটার কোমরের বেল্ট থেকে চাবিটা খুলে নিল। গোলাঘরের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল। দেখলো, অনেকগুলি কাঠের বাক্সে ঠাঁই করা কামানের গোলা। একটা বন্ধ বাক্স, সেটায় বোধহয় পিস্তলের গুলি। দেয়ালে সারি-সারি টাঙানো তরোয়াল, কুঠার, বর্শা। ফ্রান্সিস মুখ ফিরিয়ে দেখলো অন্য পাহারাদারটা ছুটে আসছে। ও এক হ্যাঁচ্কা টানে কেরোসিন তেলের কাঁচের আলোটা খুলে কামানের গোলাগুলোর ওপর ছুঁড়ে মারল। কাঁচটা ভেঙে চারিদিকে ছিটিয়ে পড়লো। কাঠের বাক্সগুলোয় কেরোসিনের আগুন ছিট্‌কে পড়ে আগুন লেগে গেল।

আলো নিভে যাওয়াতে দরজার কাছটা অন্ধকার হ'য়ে গেছে তখন? পাহারাদারটা অন্ধকারেই তরোয়াল চালাল। ফ্রান্সিস তৈরিই ছিল ও মারটা ফিরিয়ে তরোয়াল দিয়ে ঐ লোকটার তরোয়ালে চাপ দিয়ে ওকে প্রচণ্ড জোরে একটা ধাক্কা দিল। লোকটা প্রায় ছিটকে পড়ে গেল। সেই ফাঁকে ফ্রান্সিস সিঁড়িটার দিকে লক্ষ্য ক'রে ছুটল। পাহারাদারও উঠে ওর পিছু নিল। ফ্রান্সিস দ্রুত পায়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগল। পাহারাদারটাও উঠতে লাগল। দু'জনকেই প্রায় অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হচ্ছিল। কাজেই কেউই কাউকে ভালোভাবে দেখতে পাচ্ছিল না। ফ্রান্সিস হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে ঘুরে দাঁড়াল। লোকটা সঙ্গে-সঙ্গে দাঁড়িয়ে তরোয়াল তুলল। ফ্রান্সিস ঠিক তখনই লোকটার চোয়াল লক্ষ্য ক'রে একটা ঘুঁষি মারলো। লোকটা ছিট্‌কে সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে নীচে পড়ে গেল। ফ্রান্সিস সিঁড়ি দিয়ে দ্রুত উঠতে লাগল।

ডেক-এ উঠেই ও ছুটলো ক্যারাভেল-এর পেছন দিকে। ও যখন ওদের জাহাজের সঙ্গে বাঁধা কাছিটায় ঝুলে পড়ল, তখনই প্রচণ্ড শব্দে গোলাঘরে প্রথম গোলাটা ফাটলো। সমস্ত ক্যারাভেলটা কেঁপে উঠল। ফ্রান্সিস তাড়াতাড়ি দড়ি বেয়ে নিজেদের জাহাজে চ'লে এল। তারপর কাছিটার ওপর তরোয়াল চালাতে লাগল। তরোয়ালের কয়েকটা কোপ পড়তেই কাছিটা কেটে গেল। ক্যারাভেলটা আস্তে-আস্তে কিছুদূরে স'রে গেল। ওদিকে ক্যারাভেলের-এর গোলাঘরে তখন একটার পর একটা গোলা ফাটছে।

ফ্রান্সিস হাঁপাতে-হাঁপাতে কেবিনঘরগুলোর দিকে ছুটলো। তখনই হ্যারির সঙ্গে দেখা। ফ্রান্সিস বললো—শিগ্‌গির, আমাকে বেন্‌জামিনের কাছে নিয়ে চলো।

একটা কেবিন ঘরে হ্যারি ওকে নিয়ে এল। দেখল বেন্‌জামিন শুয়ে আছে। ছেঁড়া কম্বল দিয়ে ওর ডানহাতে একটা ব্যাণ্ডেজমত বাঁধা। ফ্রান্সিস ওর পাশে ব'সে হাঁপাতে লাগল। একটু দম নিয়ে ডাকল—'বেন্‌জামিন'।

বেন্‌জামিন চোখ মেলে ওর দিকে তাকাল।

—'তুমি কি আমাদের সঙ্গে যেতে চাও?' ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করল।

—'না।' বেনজামিন স্পষ্টস্বরে বলল—'আমি আমাদের জাহাজে ফিরে যাবো'।

—'আর কিছুক্ষণের মধ্যে তোমাদের জাহাজের চিহ্নমাত্রও থাকবে না।'

—'তার মানে?' বেনজামিন অবাক চোখে ওর দিকে তাকাল।

—'তোমাদের ক্যারাভেল-এর গোলাঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়ে এসেছি। শুনতে পাচ্ছো

না গোলা ফাটার আওয়াজ' ?

বেন্‌জামিন আর কোন কথা বলল না।

—'বেন্‌জামিন'—ফ্রান্সিস বলল—'অনেক নিরীহ, নিরপরাধ মানুষের চোখের জলে, বুকের রক্তে ভিজে গেছে তোমাদের ঐ ক্যারাভেল-এর ডেক, কয়েদঘর। অনেক অভিশাপ বর্ষিত হ'য়েছে ঐ অভিশপ্ত ক্যারাভেল-এর ওপর। ওটাকে পোড়াতে পেরে আমার আজ আনন্দের সীমা নেই। ঐ ক্যারাভেল-এর সঙ্গে লা ব্রুশকে পোড়াতে পারলে, আমি সবচেয়ে বেশি খুশি হতাম। কিন্তু এবার সেটা হ'ল না।' একটু থেমে ও বলল—'আমরা দেশে ফিরে যাচ্ছি। কিন্তু আমি আবার আসবো। লা ব্রুশের সঙ্গে আমার শেষ বোঝাপড়া এখনো বাকি।'

বেন্‌জামিন একইভাবে ওপরে তাকিয়ে থেকে বলল—'আমি হুকুমের চাকর।'

'সেটা আমি বুঝি বেনজামিন। তাই বলছি তুমি আমাদের সঙ্গে দেশে চলো।'

বেন্‌জামিন আস্তে-আস্তে মাথা নাড়ল।

—তা'হলে কি করবে এখন ? আমরা এক্ষুণি জাহাজের নোঙর তুলবো। তাড়াতাড়ি বলো।

বেন্‌জামিন ধীরস্বরে বলল—'আমাকে ভাজিম্বাদের একটা নৌকায় তুলে দাও। আমি চাঁদের দ্বীপে যাবো।'

—লা ব্রুশ যা নিষ্ঠুর হৃদয়হীন পশু, ও তোমাকে মেরে ফেলবে।

'—তবু—'বেন্‌জামিন মাথা নাড়ল—'আমাকে ওর কাছেই ফিরে যেতে হবে।'

'—বেন্‌জামিন—তুমি কেন নিজেকে ঐ নরঘাতটার কাছে দিয়ে যেতে চাইছো ?'

বেন্‌জামিন একবার ফ্রান্সিসের মুখের দিকে তাকাল। তারপর মুখ ফিরিয়ে বলল '—লা ব্রুশের মত প্রতিহিংসাপরায়ণ মানুষকে তোমরা চেনো না। আমি যদি পালিয়ে যাই, ও কখনো না কখনো দেশের দিকে ফেরার পথে লিসবনের কাছাকাছি কোন জায়গায় আড্ডা গড়বে। তারপর ওর কোন বিশ্বস্ত লোককে পাঠিয়ে আমার বৌ-ছেলেমেয়েকে খুন করাবে'।

'—বলো কি ?' ফ্রান্সিস আর ওখানে যারা উপস্থিত ছিল, সকলেই লা ব্রুশ যে কি সাংঘাতিক মানুষ, সেটা বুঝল।

'তার চেয়ে এই ভালো—আমার যা হবার হোক—আমার বৌ-ছেলেমেয়ে বেঁচে থাক।'

ফ্রান্সিস বা হ্যারি কেউ কোন কথা বলল না। দু'জনেই চুপ ক'রে রইল। তারপর ফ্রান্সিস হ্যারিকে ডাকলো—'চলো ওপরে ডেক-এ যাই।'

যাবার সময় দু'জন ভাইকিংকে বললো 'তোমরা বেন্‌জামিনকে ওপরে নিয়ে এসো'।

ওরা ডেকের ওপর এসে দাঁড়াল। দেখলো—ক্যারাভেলটা দাউ-দাউ ক'রে জ্বলছে। আগুনের আভায় ধারে-কাছে সমস্ত এলাকাটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। মাঝে-মাঝে দু'একটা গোলা ফাটছে। আগুনের ফুলকি ছিটকে উঠছে অনেকদূর পর্যন্ত।

বেন্‌জামিনকে তখন ওপরে আনা হ'য়েছে। ও শূন্যদৃষ্টিতে জ্বলন্ত জাহাজটার দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর মুখ ফেরাল।

ঝড়-বৃষ্টি তখন থেমে গেছে। বাতাসের সেই উন্মত্ত বেগ আর নেই।

ফ্রান্সিসদের জাহাজের কাছে একটা ভাজিম্বাদের গাছের গুঁড়ি দিয়ে তৈরী করা নৌকা ঢেউয়ের মাথায় ওঠা-নামা করছিল। ফ্রান্সিস একজন ভাইকিংকে বলল ঐ নৌকাটা জাহাজের কাছে নিয়ে আসতে। ভাইকিংটা জাহাজের দড়ি বেয়ে-বেয়ে জলে নামল। সাঁতরে গিয়ে নৌকোটা জাহাজের কাছে নিয়ে এল। একটা কাছিতে ফাঁসমত পরাসো হ'ল। তার মধ্যে বেন্‌জামিনকে বসিয়ে সেই নৌকোটায় ধ'রে-ধ'রে নামিয়ে দেওয়া হ'ল। একটা দাঁড়ও দেওয়া হ'ল। ভাইকিংটা নৌকোটাকে সজোরে চাঁদের দ্বীপের দিকে ঠেলে দিয়ে নিজে দড়ি বেয়ে-বেয়ে আবার জাহাজে উঠে এল।

জ্বলন্ত ক্যারাভেলটার আলোয় চাঁদের দ্বীপের তীর পর্যন্ত অনেকটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। ওরা দেখল—সেই নৌকাটা আস্তে-আস্তে, চাঁদের দ্বীপের দিকে চলেছে। বেনজামিন দাঁড় টানছে বাঁহাতে। কিছুক্ষণ সেই দিকে তাকিয়ে থেকে ফ্রান্সিস সকলের দিকে তাকাল। বললো—'নোঙর তোলো। দাঁড় ঘরে যাও—পাল খুলে দাও। এক্ষুণি জাহাজ ছাড়ো।'

ভাইকিংদের মধ্যে উৎসাহের ঢেউ ব'য়ে গেল। বন্দীজীবনের শেষ। এবার মুক্ত জীবন। স্বদেশে ফিরছে সবাই। উৎসাহের সঙ্গে যে যার কাজে লেগে পড়ল। জাহাজ চলল উত্তর মুখে। ভাইকিংদের দেশের উদ্দেশ্যে। বেগবান বাতাস। মেঘমুক্ত আকাশ শান্ত সমুদ্রের ওপর দিয়ে জাহাজ চলল।

পরদিন দুপুরের দিকে চোখে পড়ল ডাইনীর দ্বীপের তটরেখা, সবুজ পাহাড়। গাছ-গাছালি। সকলেই ছুটে এল ফ্রান্সিসের কাছে। ফ্রান্সিস তখন নিজের কেবিনঘরে শুয়ে ছিল। নির্বিবাদে হীরে দুটো নিয়ে দেশে না ফেরা পর্যন্ত ওর মনে স্বস্তি নেই। সবাই এসে বলল—'ডাইনীর দ্বীপ এসে গেছে। বিস্কোকে খুঁজে দেখবো আমরা।'

ফ্রান্সিস উঠে বসল। বললো 'জাহাজ তীরে ভেড়াও। জানি না বিস্কো বেঁচে আছে কিনা, তবু আমাদের খুঁজে তো দেখতে হবে।'

সমুদ্রতীরের যত কাছে সম্ভব, জাহাজ ভেড়ানো হ'ল। কিন্তু ভাইকিংদের আর দ্বীপে যেতে হ'ল না। ওরা ডেক থেকে দেখলো সমুদ্রতীরে কে একজন লোক হাতে একটা ছেঁড়া জামা নিয়ে ঘোরাচ্ছে। দূর থেকে চিনতে কষ্ট হ'লেও বুঝলো, ঐ লোকটাই বিস্কো

জাহাজ থেকে একটা ছোটো নৌকো নামানো হ'ল। কয়েকজন যাবে বিস্কোকে আনতে। ফ্রান্সিস ওদের বলল 'লা ব্রুশের গুপ্ত ভাণ্ডারের সব কিছু আমরা নিয়ে আসবো। আগ বিস্কোকে সঙ্গে নিয়ে সে সব আনতে হবে।'

চারজন নৌকো করে চলল ডাইনীর দ্বীপের দিকে। ওরা যখন দ্বীপে গিয়ে নামল, বিস্কো ছুটে এসে ওদের জড়িয়ে ধরল। বিস্কোর শরীর খুব খারাপ হ'য়ে গেছে। জামা কাপড় শতচ্ছিন্ন। তবু ও বেঁচে আছে, তাতেই সকলে খুশি হ'ল। ওরা বলল—'ফ্রান্সিস বলেছে লা ব্রুশের সব গুপ্তধন নিয়ে যেতে। আমাদের ওখানে নিয়ে চলো।'

বিস্কো বলল—'তার আগে আমার আস্তানায় চলো। গায়ে নুন মেখে নিতে হবে।'

সমুদ্রতীরের কাছেই যেখানে থেকে পাহাড়-জঙ্গল শুরু হ'য়েছে সেখানে রেন ট্রি গাছের পাতা, বাকল, এসব দিয়ে একটা ঘরমত তৈরি করা হ'য়েছে। বিস্কো বলল—'এই আমার আস্তানা।' ও গাছের পাতার একটা বড় ঠোঙায় ক'রে তেল মেশানো নুন নিয়ে এল।

—তুমি এসব পেলে কোথায় ?

'—সমুদ্রের জল থেকে নুন তৈরী করেছি—'বিস্কো বলল—'আর ঐ পূর্বকোণায় একটা ঝর্ণার জলের সঙ্গে মেশানো এই তেল পেয়েছি। এই দু'টো মিশিয়ে গায়ে মাখলে, জোঁক কামড়ে ধরলে সঙ্গে-সঙ্গে মরে যায়। এই জিনিসটা ব্যবহার করতাম বলেই আমি এখনো বেঁচে আছি।

সকলেই সেই তেল-নুন গায়ে মেখে নিল। তারপর বিস্কো ওদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চললো। গাছাগাছালি ঘেরা হাজার-হাজার জোঁকের জায়গাটা ওরা পেরোলো। ওদের জোঁকে কামড়ে ধরলো বটে, কিন্তু মুহূর্তেই মরে খসে পড়লো।

ওরা লা ব্রুশের গুপ্তধন রাখার গুহাটার কাছে এল। বিস্কো ব'লে দিলো কিভাবে পাথরের মুখটা সরাতে হবে। সবাই ধাক্কাধাক্কি ক'রে নিরেট পাথরটা কিছুটা সরাল। তারপর সবাই ভেতরে ঢুকল। অন্ধকার গুহা। প্রথমে কিছুই দেখতে পেল না। অন্ধকারটা সরে আসতে ওরা দেখলো বেশ কয়েকটা নরকঙ্কাল পড়ে আছে। তার মধ্যে ওদের দু'জন বন্ধুর কঙ্কালও রয়েছে। বিস্কো আসবার সময় পথে সব ঘটনা ওদের বলেছে। গুহাটার শেষের দিকে বেশ কয়েকটা বাক্স রয়েছে। ওপরে পেতলের কাজ করা। ওরা ঐ দু'টো বাক্স নিয়ে জোঁকের জায়গাটা পেরিয়ে সমুদ্রের ধারে চ'লে এল। বাক্স দু'টো নৌকায় তোলা হ'ল। বিস্কো আর একজন ভাইকিং নৌকায় চড়ে বাক্স দু'টো জাহাজে নিয়ে এলো। সবাই ছুটে এসে বিস্কোকে জড়িয়ে ধরলো। বিস্কোকে নতুন কাপড়-জামা দেওয়া হ'ল। তারপর খাবার ঘরে নিয়ে যাওয়া হ'ল ওকে। এতদিন পরে বন্ধুদের দেখে ওর যেন কথা আর ফুরোতে চায় না। ফ্রান্সিস বলল—'বিস্কো পরে সব শুনবো, এখন পেট পুরে খেয়ে নাও।'

নৌকাটা একজন ভাইকিং চালিয়ে নিয়ে গেল ডাইনীর দ্বীপে, আবার গুপ্তধনের কাছে। গুহা থেকে দু'টো ভারি বাক্স জাহাজে নিয়ে আসা হ'ল। সন্ধ্যের আগেই লা ব্রুশের অত সাধের গুপ্ত ধনভাণ্ডার শূন্য হ'য়ে গেল। সব জাহাজে তুলে নিয়ে আসা হলো।

বাক্সের তালাগুলো ভাঙা হলো। ফ্রান্সিস আর হ্যারি বাক্সগুলো খুলে-খুলে দেখলো। কত মোহর, কত জড়োয়ার গয়না। হীরে-মুক্তো বসানো ছোরা, ছোট আকারের তরবারি। কত বিচিত্র আকারের গয়না-গাঁটি। সকলই এসে জড়ো হ'ল সেখানে। সকলের চোখেই বিস্ময়। এসব জিনিসের গল্পই শুনেছে ওরা। জীবনে কোনদিন দেখেনি।

সন্ধ্যের পরেই জাহাজ ছেড়ে দেওয়া হ'ল। শান্ত সমুদ্রের ওপর দিয়ে জাহাজ উত্তরমুখে যাত্রা শুরু করলো। ভাইকিংদের আজ খুব আনন্দের দিন। অত বড় দু'টো হীরে, মোহর, মণিমাণিক্য ভরা লা ব্রুশের লুটের সম্পদ সব আজ ওদের হাতে।

রাত্রিবেলা জাহাজের ডেক-এর ওপর নাচগানের আসর বসলো। সবাই নাচ-গানের তালে-তালে হাততালি দিতে লাগল। জমে উঠলো আসর।

ফ্রান্সিসও ঐ আসরে কিছুক্ষণ বসেছিল। তারপর একটু রাত হ'তেই নিজের কেবিনে ফিরে এল। রাত্রে জাহাজ পাহারা দেবার জন্যে পাহারাদারের সংখ্যা বাড়াল ফ্রান্সিস। লা ব্রুশের মতো আবার কোন জলদস্যু যাতে অনায়াসে রাত্রির অন্ধকারে এসে জাহাজ খালি

না করতে পারে। সকলেই ফ্রান্সিসের কথা মেনে নিল। দিনরাত সমানে জাহাজ পাহারা দিতে লাগল ওরা।

জাহাজ চললো। ফ্রান্সিসের ইচ্ছে মরিটাস দ্বীপের খোঁজটা নিয়ে যাওয়া। কথাটা ও হ্যারি আর অন্যান্য ভাইকিংদের বলল। অনেকেই জানতে চাইল, দ্বীপটা কোথায়? ফ্রান্সিস বলল—'আমি সঠিক জানি না। তবে পশ্চিম আফ্রিকার কাছাকাছি কোথাও হবে। চাঁদের দ্বীপ থেকে খুব বেশি দূরে নয়। রাজপুরোহিত মরিটাস দ্বীপে এসে বসির আয়নাঅলার কাছ থেকে আয়না তৈরি করিয়ে নিয়ে যেতো। কাজেই মরিটাস বেশি দূরে হবে বলে মনে হয় না। আমাদের পূর্বদিকে যেতে হবে।'

বেশির ভাগ ভাইকিং বন্ধুরা কিন্তু আপত্তি করল। বললো—'আমরা অনেকদিন দেশ ছেড়ে এসেছি। সঙ্গে আমাদের অত্যন্ত মূল্যবান হীরে আর লা ব্রুশের গুপ্তধন রয়েছে। আমাদের তাড়াতাড়ি দেশে ফিরতে হবে। পথে দেরি করলে কে জানে আবার কোনো বিপদে পড়বো কিনা। ফ্রান্সিস একটু ভাবল। তারপর ওদের কথাতেই রাজি হল। হ্যারিও ওকে তাই বোঝাল। এখন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নিরাপদে দেশে ফিরতে হবে।

জাহাজ আর পূর্বদিকে ফেরানো হ'ল না। সবাই প্রচণ্ড উৎসাহ নিয়ে জাহাজের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ল। গতি আরো দ্রুত হলো। দাঁড়িরা দাঁড় বাইতে লাগল, আরো দু'টো বাড়তি পাল লাগানো হ'লো। জাহাজ চলল পূর্ণ বেগে।

সমুদ্রপথে বার দুই-তিনেক ঝড়ের কবলে পড়তে হলো। তবে ঝড় খুব সাংঘাতিক কোন ক্ষতি করতে পারলো না। ভাইকিংরা প্রাণপণে ঝড়ের সঙ্গে লড়াই করলো। যে ক'রেই হোক জাহাজটাকে অক্ষত রাখতে হবে। দু'একটা পাল ফেঁসেও গেল। এর চেয়ে বেশি কোন ক্ষতি হ'ল না।

বেশ অল্পদিনের মধ্যেই জাহাজটা ইউরোপের কাছাকাছি এসে গেলো। তারপর দিন দশেকের মাথায় ভাইকিংদের রাজধানীর 'ডক'-এ এসে জাহাজটা লাগল। তখন ভোর হয়েছে সবে। বন্দরে লোকজন বেশি ছিল না। এরকম কত জাহাজ তো আসে। ওরা সেইভাবেই এক নজর তাকিয়ে জাহাজটাকে দেখলো শুধু।

ফ্রান্সিসের ভাইকিং বন্ধুদের আর তর সইল না। জাহাজ 'ডক'-এ লাগাবার সঙ্গে-সঙ্গে ওরা লাফিয়ে নেমে পড়ল। যে যার বাড়িতে চলে গেল। ওদের মুখেই শহরবাসীরা প্রথম জানতে পারল ফ্রান্সিস দুটো বিরাট হীরের খণ্ড আর জলদস্যু ক্যাপ্টেন লা ব্রুশের ধনসম্পদ বোঝাই ক'রে ফিরেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই খবরটা সারা শহরে ছড়িয়ে পড়ল।

এদিকে জাহাজে হীরে দু'টো আর লা ব্রুশের ধনসম্পদ পাহারা দেবার লোকের অভাব পড়ে গেল। অনেকেই বাড়ি চ'লে গেছে, বাকি যারা রইল, তারাও বাড়ি যাবার জন্যে ছটফট করতে লাগল। ফ্রান্সিসকে তারা তাদের ছেড়ে দেবার জন্যে বারবার অনুরোধ করতে লাগল। ফ্রান্সিস আর কি করে? ও তখন একজনকে রাজার কাছে পাঠাল। সংবাদ দিল রাজাকে যে আমরা অত্যন্ত মূল্যবান কিছু জিনিস এনেছি, আপনি জাহাজ পাহারা দেবার জন্যে কিছু সৈন্য পাঠান।।

কিছুদিনের মধ্যেই ঘোড়ায় চড়ে একদল সৈন্য এল। ফ্রান্সিস নিশ্চিন্ত হ'ল। এবার ওদের হাতে পাহারার ভার দিয়ে ও আর হ্যারি বাড়ি যেতে পারবে। কিন্তু ফ্রান্সিসের

আর বাড়ি যাওয়া হ'ল না। সৈন্যদের মধ্যে যে নেতা ছিল, সে ফ্রান্সিসের হাতে একটা চিঠি দিল। রাজা লিখেছেন—'তোমার কথামত সৈন্য পাঠালাম। তুমি আর হ্যারি জাহাজ থেকে নামবে না। তোমাদের উপযুক্ত সম্বর্ধনা জানাবার ব্যবস্থা করছি।'

ফ্রান্সিস হ্যারিকে চিঠিটা দেখাল। হ্যারি হেসে বললো—'সোনার ঘন্টা আনার সময় তো আমরা ছিলাম না। তাই এবার আমাদের সম্বর্ধনা জানিয়ে সেটা পুষিয়ে দেবে'।

কাজেই ফ্রান্সিস আর হ্যারিকে জাহাজেই থাকতে হ'ল। ওদের আর বাড়ি যাওয়া হ'ল না। অন্য সব ভাইকিং বন্ধুদের ওরা বাড়ি চলে যেতে বললো।

এর মধ্যেই খবরটা ছড়িয়ে পড়েছে। জাহাজঘাটায় মানুষের ভিড় বাড়তে লাগল। সবাই নির্বাক বিস্ময়ে হীরে দু'টো দেখছে। আস্তে-আস্তে ভিড় বাড়তে লাগল। ঘন্টাখানেক না যেতেই বিরাট জনারণ্যের সৃষ্টি হ'ল। 'ডক'-এর সামনে রাস্তাঘাট লোকে ভ'রে গেলো। সবাই ফ্রান্সিসকে দেখতে চায়। ফ্রান্সিস ডেক-এ উঠে আসুক, জোর গলায় লোকেরা এসব বলতে লাগলো। হ্যারি বললো—ফ্রান্সিস একবার ডেক-এ উঠে ওদের সামনে দাঁড়াও। ওরা তোমাকে দেখতে চাইছে। ফ্রান্সিস বিরক্তির সঙ্গে বললো—'এ সব আমার ভালো লাগে না।'

'—তবু ওরা চাইছে, তোমারই তো স্বদেশবাসী। যাও।' হ্যারি বললো।

ফ্রান্সিস ঘাড়ে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল—'তাহলে তুমিও চলো।'

'—বেশ—'

দু'জনের কেবিনঘর থেকে বেরিয়ে ওপরে ডেক-এ এসে দাঁড়াতেই জাহাজঘাটার জনারণ্য আনন্দে উদ্বেল হ'য়ে উঠল। সে কি বিপুল হর্ষধ্বনি দিতে লাগল।

হঠাৎ জনসাধারণের মধ্যে চাঞ্চল্য জাগলো। রব উঠল—'রাজা আসছেন—রাজা আসছেন।' জনতা সরে দাঁড়িয়ে পথ করে দিলো। সামনে সুন্দর পোষাক সুজ্জিত রাজার দেহরক্ষীদল ঘোড়ায় চ'ড়ে আসছে। পেছনে রাজার গাড়ি। কালো দামী কাঠের গাড়ি। ধবধবে সাদা চারটে ঘোড়া টেনে আসছে। গাড়ির গায়ে সোনালি-রূপালী রঙের কত কারুকাজ। মাথাটা খোলা। সামনে কোচ্ম্যান বসে আছে। লাল-সাদা কি সুন্দর পোষাক তার পরনে। মাথার টুপিতে সোনালি ঝালর। ঘোড়াগুলোর পিঠে ও সোনালি ঝালর দেওয়া সাজ। গাড়ির ভেতরে মুখোমুখি দু'টো বসার গদি। তাতেও নানা কারু-কাজ। একদিকের আসনে ব'সে আছেন রাজা আর রাণী। বিশেষ উৎসবের দিনে তাঁরা যেমন পোষাক পরনে, আজকেও পরণে তেমনি পোষাক। রাণীর পরণে ধব্ধবে সাদা পোষাক, তাতে সোনালী জরির সূক্ষ্ম কাজ করা। রাজার পরণে সবুজ রঙের পোষাক। তার বোতামগুলো সোনার। মাথায় হীরে বসানো সোনার মুকুট।

রাজা-রাণীকে দেখে সেই বিরাট জনারণ্যে হর্ষধ্বনি উঠল। রাজার দীর্ঘজীবন কামনা ক'রে ধ্বনি উঠল। রাজা-রাণী হাসিমুখে সকলের দিকে হাত নাড়াতে লাগলেন। রাজার গাড়ির পেছনে আরো কয়েকটা সুসজ্জিত গাড়ি। তাতে আসছেন মন্ত্রী অর্থাৎ ফ্রান্সিসের বাবা ও গণ্যমান্য অমাত্যরা।

রাজার গাড়ি এসে ফ্রান্সিসদের জাহাজটার কাছে থামল। বাঁধানো ডক থেকে জাহাজ পর্যন্ত একটা বড় কাঠের তক্তা আগে থেকেই ফেলা ছিল। রাজা-রানী নামলেন। তারপর

তক্তাটার ওপর দিয়ে হেঁটে গিয়ে জাহাজটায় উঠলেন। ফ্রান্সিস আর হ্যারি এগিয়ে এল। রাজা ফ্রান্সিসকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। তারপর হ্যারিকে। ফ্রান্সিস রাজাকে হীরের গাড়ির কাছে নিয়ে গেল। একজন সৈন্য ছেঁড়া পালের ঢাকাটা খুলে দিলো। তখন সূর্যের আলো পড়ল হীরে দু'টোর ওপর। কি অপূর্ব তেজালো দ্যুতি বেরোতে লাগলো হীরে দু'টো থেকে। হাজার-হাজার বিস্ময়াবিষ্ট মানুষগুলোর মুখে কোন কথা নেই। রাজাও বিস্ময়ে হতবাক হ'য়ে এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর ঘুরে-ঘুরে হীরে দু'টো দেখতে লাগলেন। এত বড় হীরে? এতো অবিশ্বাস্য! রাজার চোখ-মুখ খুশিতে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল। তিনি এবার পেছন ফিরে জাহাজঘাটার জনারণ্যের দিকে তাকিয়ে হাত তুললেন। সব গোলমাল, গুঞ্জন থেমে গেল। রাজা গলা চড়িয়ে বলতে লাগলেন 'দেশবাসীগণ, ফ্রান্সিস, হ্যারি আর তাদের বীর সহগামীরা যে দুঃখ-কষ্ট স্বীকার ক'রে এই হীরে দু'টো এনেছে, তার জন্যে তাদের আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তারা আমাদের দেশের মুখ উজ্জ্বল করেছে। তাদের সম্মানার্থে আমি সারা দেশে আজ থেকে তিনদিন উৎসবের দিন ব'লে ঘোষণা করলাম। দেশবাসীগণ,—আপনারা তাদের দীর্ঘজীবন কামনা করুন!'

রাজার কথা শেষ হ'তেই হাজার কণ্ঠে ফ্রান্সিস ও হ্যারির জয়ধ্বনি উঠল। রাজা দু'হাত তুলে আবার সবাইকে থামালেন। বলতে লাগলেন—'আমার প্রিয় দেশবাসীগণ। আজকে আমার কি আনন্দ হচ্ছে, তা আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না। যেদিন সোনার ঘণ্টা নিয়ে এসেছিলাম, সেদিনও আমরা আনন্দোৎসব করেছিলাম। কিন্তু সেদিনের আনন্দোৎসবে দুই বীর ভাইকিং ফ্রান্সিস আর হ্যারি অনুপস্থিত ছিল। তাই আজকে আমার সবচেয়ে বেশি আনন্দ হচ্ছে।'

আবার একটু থেমে রাজা বলতে লাগলেন—'হীরে দু'টো আজকে এই জাহাজেই থাকবে। কালকে হীরে দুটো নিয়ে মিছিল বেরোবে এবং সারা রাজধানী ঘুরবে। তারপর হীরে দু'টোকে প্রাসাদে নিয়ে যাওয়া হবে।'

রাজা থামলেন। আবার জনতা হর্ষধ্বনি ক'রে উঠল। হ্যারি রাজার কাছে এগিয়ে এল। বললো—'আপনি নিশ্চয়ই কুখ্যাত জলদস্যু লা ব্রুশের নাম শুনেছেন'?

—হুঁ—ও জাতে ফরাসী।

—আজ্ঞে হ্যাঁ। ওর গুপ্ত ধনভাণ্ডারও আমরা উদ্ধার ক'রে নিয়ে এসেছি।

—'বলো কি!' রাজা অবাক হলেন।

—চলুন, আপনি দেখবেন আসুন।

রাজাকে মালখানাঘরে নিয়ে গেল হ্যারি আর ফ্রান্সিস। সেই পেতলের কাজকরা বাক্সগুলো খুলে রাজাকে দেখালো ওরা। রাজা এত দামী গয়নাগাঁটি, মোহর দেখে অবাক। রাজা কিছুক্ষণ ঐ গয়নাগাঁটি হীরে-জহরতের দিকে তাকিয়ে বললেন—'এসব পাপের ধন সব বিক্রি করে সেই অর্থ কোন সৎকাজে লাগাতে হবে।'

রাজা ডেক-এ উঠে এলেন। তারপর কাঠের তক্তার উপর দিয়ে ডেকে এলেন। ফ্রান্সিস আর হ্যারিকেও সঙ্গে আসতে বললেন। ওরা দু'জনে পরপর নেমে এল। রাজা বললেন—'তোমরা আমাদের গাড়িতে চড়ে আমাদের সঙ্গে প্রাসাদে যাবে।'

রাজা ও রাণীর সঙ্গে এক গাড়িতে চড়া ! ফ্রান্সিস আর হ্যারি পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন। রাজা গাড়িতে উঠে ওদের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন। ওরা দু'জনে রাজা-রাণীর সামনের দিকে লাল গদি মোড়া জায়গায় গিয়ে বসলো। আবার উপস্থিত জনতা হর্ষধ্বনি ক'রে উঠল। সামনে সুসজ্জিত ঘোড়ায় চড়া দেহরক্ষীরা, পেছনে গণ্যমান্য অমাত্য ও মন্ত্রীর গাড়ী। যাত্রা শুরু হ'লো রাজপ্রাসাদের উদ্দেশ্যে।

পথেও শহরবাসীদের উপচে পড়া ভীড়। সেই ভীড়ের মধ্যে দিয়ে যেতে বেশ দেরিও হ'ল। উপস্থিত সবাই রাজা-রাণী আর ফ্রান্সিস ও হ্যারির জয়ধ্বনি করল।

রাজপ্রাসাদের বিরাট চত্বরে পেঁছে রাজা-রাণীর গাড়ি থেকে নেমে এলেন। ফ্রান্সিস আর হ্যারিও নামল। রাজা-রাণীর সামনে ফ্রান্সিস এসে দাঁড়ালো। বললো—'আমরা অনেকদিন বাড়ী ছাড়া। বুঝতেই পারছেন মানে—'

'—নিশ্চয়ই-নিশ্চয়ই। তোমরা এখন বাড়ি যাও।' রাজা বললেন।

রাণী একটু হেসে বললেন—'এখন ছাড়া পেলে। কিন্তু আজ রাতে প্রাসাদে তোমাদের নিমন্ত্রণ। রাতের খাবারটা আমাদের সঙ্গে খাবে।'

কথাটা ব'লে রাণী ডানহাতের দস্তানাটা খুলে হাতটা এগিয়ে দিলেন। ওরা দু'জন সসম্ভমে রাণীর হাত চুম্বন করল। রাজা-রাণী প্রাসাদের মধ্যে প্রবেশ করলেন।

'—বাড়ি চলো।' পেছনে বাবার কণ্ঠস্বর শুনে ফ্রান্সিস ফিরে তাকালো। ফ্রান্সিস কোন কথা না ব'লে বাবার গাড়িতে গিয়ে উঠে বসল। আর একজন অমাত্য হ্যারিকে তাঁর গাড়িতে ডেকে নিলেন। গাড়ি চললো। মন্ত্রীমশাই কিছুক্ষণ বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখলেন রাস্তার জড়ো হওয়া লোকজন বাড়ি ফিরে যাচ্ছে। কেউ-কেউ ফ্রান্সিসকে চিনতে পেরে হাত বাড়িয়ে দিলো। গাড়ি খুব দ্রুত চলছে না। ফ্রান্সিস হেসে সকলের সঙ্গেই করমর্দন করল। ওর বাবা এবার কোচ্‌ম্যানকে লক্ষ্য করে বললেন—'গাড়ি জোরসে চালাও।' এবার গাড়ি দ্রুত ছুটল। রাস্তার লোকেরা কেউ-কেউ ফ্রান্সিসকে দেখে হাত নাড়ল। ফ্রান্সিসও হাত নাড়ল। এবার ওর বাবা বললেন—'আবার কবে পালাবে ?'

ফ্রান্সিস উৎসাহের সঙ্গে বলতে লাগল—'বাবা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না, কি বড়-বড় মুক্তো।'

'তোমাকে পাহারা দেবার জন্যে দু'ডজন সৈন্য বাড়িতে মোতায়েন করবো।' ফ্রান্সিস কোন কথা বললো না। চুপ ক'রে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল। হঠাৎ কেমন একটু ধরাগলায় বাবা বললেন—'হঁ্যারে, তুই তোর কি মা'র কথাও ভাবিস্ না' ?

ফ্রান্সিস মাথা নীচু করলো।

—'তোর মা তোর জন্যে ভেবে-ভেবে অকালে মরে যাক্, এটাই কি চাস্ তুই ?'

ফ্রান্সিস কোন কথা বলতে পারলো না। মা'র কথা ওর বড় বেশি ক'রে মনে পড়তে লাগল। আস্তে-আস্তে বলল—'মা কেমন আছেন ?'

—'মনে শান্তি থাকলে তো ভালো থাকবে ?' বাবা চড়া গলায় বললেন।

গাড়িতে আর কোন কথা হ'ল না। বাড়ির কাছে আসতে ফ্রান্সিস দেখলো দেয়ালে-দেয়ালে জড়ানো সেই লতাগাছটা আরো বেড়েছে। সমস্ত দেওয়ালটাতেই ছড়িয়ে পড়েছে আর অজস্র নীলফুল ফুটে আছে সমস্ত দেওয়াল জুড়ে। ও দেখলো গেট-এর কাছে মা

দাঁড়িয়ে আছে। সঙ্গে একজন পরিচারিকা। মা'র মুখ-শরীর আরো শীর্ণ হ'য়েছে। মুখে সুস্পষ্ট বলিরেখা। একটা বুক শূন্যভরা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল ওর। একসঙ্গে আনন্দের, আবার দুঃখেরও।

ফ্রান্সিস তাড়াতাড়ি গাড়ি থেকে নেমে ছুটে গিয়ে মা'কে জড়িয়ে ধরলো। মা ওর কপালে চুমু খেল। বিড়বিড় ক'রে বলতে লাগলো, 'চিরকালের পাগল তুই—কবে তোর এই পাগলামো যাবে, এ্যাঁ? বুড়ি মা'র কথা একবারও মনে পড়ে না তোর?'

ফ্রান্সিস অশ্রুরুদ্ধস্বরে বলল—'আমার মা বুড়ি মা।'

মা হাসল। কিছু বলল না। বাবা এর মধ্যে কাছে এলেন। বললেন—'চলো।'

বাড়ির দিকে যেতে-যেতে মা বললো, 'হ্যাঁরে—সবাই বলছে তুই নাকি বিরাট দু'টো হীরে এনেছিস্?'

—'হ্যাঁ মা। কালকে তোমাকে জাহাজঘাটে নিয়ে গিয়ে দেখাবো।'

মা মাথা নাড়লেন—'ও দেখে কি হবে। তুই ফিরে এসেছিস্ এতেই আমি খুশি।'

বাবার দিকে তাকিয়ে বলল—'দেখছো, ছেলেটা কেমন রোগা হ'য়ে গেছে।'

বাবা একবার ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে মুখে একটা শব্দ করলেন—'হুম্।'

* * *

সন্ধ্যে হ'তে না হ'তেই মা ফ্রান্সিস বলতে লাগল—'রাজার বাড়ি নিমন্ত্রণ খেতে যাচ্ছিস, একটু সভ্য-ভব্য হবি তো?'

ফ্রান্সিস হেসে বলল—'আমি কি বুনো-ভাজিম্বাদের মত?'

'—ভাজিম্বা আবার কারা?' মা তো অবাক।

'—সে তুমি বুঝবে না। যাকগে—কি করতে হবে বলো।'

'—ভালো ক'রে, স্নান-টান ক'রে, পরিপাটি মাথার চুল আঁচড়ে, সবচেয়ে ভালো পোষাকটি পরে, সুগন্ধি গায়ে ছড়িয়ে রাজবাড়িতে যেতে হবে?'

ফ্রান্সিস কপালে ভুরু তুললো—'এতো কিছু করতে হবে?'

মা হাসল—'হ্যাঁ, শুধু রাজার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিস না, নিমন্ত্রণ খেতে যাচ্ছিস—কাজেই—।'

মা যেভাবে বললো, সে ভাবেই ফ্রান্সিসকে সাজগোজ করতে হ'ল। গাড়িতে উঠে দেখলো বাবাও বিশেষ সাজপোষাক পরেছেন। মা শরীর ভালো নেই বলে গেলেন না।

গাড়ি চললো। কিছুক্ষণের মধ্যেই গাড়ি রাজপ্রাসাদের সিঁড়ির সামনে পোঁছলো। চারদিকে নানারঙের নানারকমের ঘোড়ায় টানা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। অতিথি অভ্যাগতের সংখ্যা বেশ হবে ব'লেই ফ্রান্সিসের মনে হ'ল।

বিরাট হলঘরে একদিকে নাচ-বাজনার আসর। অন্যদিকে বিরাট টেবিলে নানা মুখরোচক খাবার সাজানো। টেবিলের ধারে-ধারে চেয়ার পাতা। মাথার ওপরে ঝাড়-লণ্ঠন। তাতে নানা আকারের রঙীন কাঁচ বসানো। দেয়ালে বিরাট-বিরাট তেলরঙের ছবি। চারদিক আলোয়-আলোয় ঝক্‌মক্ করছে।

ফ্রান্সিস যখন বাবার সঙ্গে ঢুকলো, তখন ঢিমে-তালে বাজনা বাজছে। অভ্যাগত স্ত্রী-পুরুষ জোড়ায়-জোড়ায় নাচছে, সেই বাজনার তালে-তালে। প্রবেশের দরজার মুখোমুখি

রাজা-রাণী আর রাজকুমারী মারিয়া বসে আছে। ফ্রান্সিসের বাবা রাজার কাছে গিয়ে একটু মাথা নিচু ক'রে আবার সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। রাণী ডানহাত বাড়িয়ে দিলেন। তিনি রাণীর হস্ত চুম্বন করলেন। বাবার দেখাদেখি ফ্রান্সিসও তাই করল। ওর বাবা তারপর যেদিকে গণ্যমান্য অমাত্যরা হাতের মদের গ্লাস নিয়ে এখানে-ওখানে জটলা বেঁধে কথাবার্তা বলছেন, সেখানে চলে গেলেন।

রাজা রাজকুমারী মারিয়ার দিকে তাকিয়ে বললেন—'এই হচ্ছে ফ্রান্সিস'।

ফ্রান্সিস এগিয়ে গিয়ে মারিয়ার হস্ত চুম্বন করল। কি অপরূপ সুন্দরী মারিয়া। ফ্রান্সিস সব ভুলে বেশ বোকার মতই রাজকুমারীর দিকে তাকিয়ে রইলো।

মারিয়া হেসে বলল—'আপনি খাবার সময় আমার পাশে বসবেন—আপনার সোনার ঘণ্টা, হীরে দু'টো আনার গল্প শুনবো।'

ফ্রান্সিস তখনো দেখছে রাজকুমারীকে। হলুদ গাউন পরে রাজকুমারীকে মনে হচ্ছে যেন একটা ফুটন্ত ফুল। রাজকুমারী হাসলে গালে টোল পড়ে। রাজা একটু কাশলেন। ফ্রান্সিস ফের সম্বিত ফিরে পেল। তাড়াতাড়ি বলে উঠল 'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।'

তারপর বেশ দ্রুতপায়ে ওখান থেকে সরে এল। দেখলো, একপাশে ওর সব বন্ধুরা দাঁড়িয়ে পরস্পর কথা বলছে। সবাই সেজেগুজে এসেছে। হ্যারিও রয়েছে। বন্ধুদের মধ্যে এসে ও যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। এত জাঁক-জমক, আলো-বাজনা নাচ ও বিচিত্র দামী-দামী পোষাকে সজ্জিত নরনারীর ভীড়, এসব ভালো লাগছিল না ওর। কিন্তু এখান থেকে এখন চলেও যাওয়া যায় না। স্বয়ং রাণীর নিমন্ত্রিত অতিথি ওরা। ভালো না লাগলেও থাকতে হবে। ও হ্যারির সঙ্গে অন্য বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করতে লাগল, আর অপেক্ষা করতে লাগল কতক্ষণে খাওয়ার ডাক পড়বে। খাওয়াটা হ'য়ে গেলেই এই জায়গা থেকে পালানো যাবে। কিন্তু খাওয়ার তখনও অনেকদেরি। তখন নাচের আসর জমে উঠেছে। সুবেশা সুন্দরী মেয়েরা এসে ফ্রান্সিসের বন্ধুদের নাচের আমন্ত্রণ জানাতে লাগল! ওর বন্ধুরা প্রায় সকলেই কিছুক্ষণ সময় নেচে এলো। ফ্রান্সিস হ্যারিকে নিয়ে একটা থামের আড়ালে আত্মগোপন করলো, পাছে কোন মেয়ে ওদের নাচের আমন্ত্রণ জানায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আত্মগোপন করা গেল না। রাজকুমারী মারিয়া খুঁজে-খুঁজে থামের পেছনে ফ্রান্সিসকে আবিষ্কার করল। হাত বাড়িয়ে বলল—'চলুন আমার সঙ্গে, নাচবেন আসুন।'

হতাশার একটা ভঙ্গি ক'রে ফ্রান্সিস মারিয়ার সঙ্গে নাচের জায়গায় এলো। দু'জনে বাজনার তালে-তালে নাচতে লাগল। যারা নাচতে-নাচতে ওদের দু'জনের কাছে যারা আসছে, তারাই মাথা নুইয়ে একবার ক'রে রাজকুমারীকে অভিবাদন জানাচ্ছে। নাচতে-নাচতে রাজকুমারী বললো 'এবার কি আনতে যাবেন?'

যাক্ অন্য কিছু জিজ্ঞেস করে নি। এমন একটা বিষয় জিজ্ঞেস করেছে, যা নিয়ে কথা বলতে ফ্রান্সিসের উৎসাহ কমতি নেই। ও নাচ থামিয়ে হাত দিয়ে দেখালো—'জানেন, মুক্তোর সমুদ্রের মুক্তোগুলো এত বড়-বড়।'

রাজকুমারী হাসল। তার চোখে বিস্ময়! বললো—'বলেন কি?'

—আমি নিজের চোখে দেখেছি।

—আমার জন্যে কিন্তু একটা বড় মুক্তো আনবেন, আমি লকেট তৈরি করবো।

'—আনবো বৈকি !' ফ্রান্সিস বলল—'ওসব তো বিক্রী করা যাবে না।'

—কেন ?

—চাঁদের দ্বীপের অধিষ্ঠাতা দেবতার অভিশাপ লাগবে।

—চাঁদের দ্বীপ কোথায় ?

—আফ্রিকার দক্ষিণ-পশ্চিম বরাবর।

—আপনি কবে যাবেন ?

ফ্রান্সিস একটু চিন্তিতস্বরে বলল—'দেখি।'

নাচের বাজনা থেমে গেল। সকলেই করতালি দিল। ফ্রান্সিসও সঙ্গে-সঙ্গে রাজকুমারীর অভিবাদন জানিয়ে থামের আড়ালের কাছে চ'লে এল। দেখলো, হ্যারি দাঁড়িয়ে আছে। এখনও ওকে কেউ পাকড়াও করতে পারে নি। হ্যারি মুচকি হেসে বলল—রাজকুমারী যেভাবে তোমাকে ডেকে নিয়ে গেল, তাতে সত্যিই তুমি ভাগ্যবান।

—এখন ভাগ্যে খাওয়াটা জুটলেই পালাতে পারি।

—আমারও এত জাঁকজমক, বাজনা, নাচ, ভীড় ভালো লাগছে না।

একসময় রাজা উঠে দাঁড়িয়ে সবাইকে আহারে বসতে বললেন। সবাই একে-একে খেতে বসলো। একজন পরিচারক এসে ফ্রান্সিসকে ডেকে নিয়ে গেল। ওকে রাজকুমারীর পাশেই বসতে হ'ল। সামনে টেবিলের কত রকমের খাবার থরে-থরে সাজানো। চাইলেই পরিবেশনকারীরা খাবার তুলে দিচ্ছে। কেউ-কেউ নিজেরাই তুলে নিচ্ছে। রাজকুমারী খেতে-খেতে বলল—আপনার 'সোনার ঘণ্টা' গল্পটা আমায় বলুন।

ফ্রান্সিসের মনে পড়লো, আমদাদ শহরের বাজারে কুয়োর ধারে খেজুরতলায় কতদিন এই গল্পটা বলেছে ও। সেইভাবেই ও গল্পটা বলতে শুরু করল। কুয়াশা, ঝড় আর জাহাজ ভেঙে যাওয়ার ঘটনাগুলো বলার সময় ও খেতে ভুলে যাচ্ছিলো। রাজকুমারী হেসে তখন বললো—'খেতে-খেতে বলুন।'

এক সময় খাওয়া শেষ হ'ল। সকলেই টেবিল ছেড়ে উঠে এল। ফ্রান্সিসের গল্পও শেষ হ'ল। রাজকুমারী বললো—'কিন্তু আপনার হীরে আনার গল্পটা শোনা হ'ল না। ওটা কবে বলবেন ?'

ফ্রান্সিস কি বলবে ভেবে পেল না। আমতা-আমতা ক'রে বললো—'সেটা মানে—যেদিন আপনি বলবেন।'

'—ঠিক আছে আমি আবার খবর পাঠাবো।'

ফ্রান্সিস হ্যারিকে খুঁজতে লাগল। ভীড়ের একপাশে ওকে পেলো। বললো, 'চলো পালাই।'

—রাজা-রাণীকে অভিবাদন জানিয়ে যেতে হয়, এটাই রীতি। দেখছো না, সকলেই রাজা-রাণীকে অভিবাদন জানিয়ে চ'লে যাচ্ছে।

'—চলো, ওটা সেরে আসি।' ওরা যখন রাজা-রাণীকে মাথা নুইয়ে অভিবাদন জানাচ্ছে, তখন পাশে বসা রাজকুমারী হেসে মৃদুস্বরে বলল—'আমি কিন্তু খবর পাঠাবো।'

ফ্রান্সিস মাথা ঝুঁকিয়ে সম্মতি জানাল।

দু'জনে বাইরে আসছে। হলঘরের দরজার কাছেই বাধা। ফ্রান্সিসের বাবা দাঁড়িয়ে বললেন—'আমার সঙ্গে যাবে।'

'—হ্যারি রয়েছে আমার সঙ্গে—'

'—হ্যারিও আমাদের সঙ্গে যাবে। ওকে ওর বাড়ির কাছে নামিয়ে দেবো।'

আর উপায় নেই, বাবার সঙ্গে যেতেই হবে। তিনজনে গাড়িতে উঠলো। গাড়ি চললো। কেউ কোন কথা বলছে না। ফ্রান্সিস, হ্যারি দু'জনেই বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল। ফ্রান্সিসের বাবা এক সময় বললেন—'তুমি রাজকুমারীকে কি বলছিলে অতো।'

'—সোনার ঘণ্টার গল্পটা শোনাচ্ছিলাম।'

'—হুম্।' ওর বাবা আর কিছু বললেন না।

* * *

পরের দিন সকালে জাহাজ থেকে হীরের গাড়ি দু'টো নামানো হ'ল। ঘোড়া জুড়ে গাড়ি দু'টোকে রাস্তায় আনা হ'ল। সামনে সুসজ্জিত অশ্বারোহী সৈন্যদল, পেছনেও আর একদল অশ্বারোহী সৈন্য। গাড়িটা দু'জন কোচ্ম্যান চালাতে লাগল। মিছিল চললো রাজধানীর পথ দিয়ে। হাজার-হাজার লোক জড়ো হলো রাস্তায়, বাড়ির ছাতে, বারান্দায়, অলিন্দে। অবাক বিস্ময়ে সবাই দেখতে লাগল হীরে দু'টো। সূর্যের আলো সোজা পড়েছে হীরে দু'টোয়। নীল, বেগুনী, সবুজে কত বিচিত্র রঙের আলোর খেলা চললো হীরে দু'টোর গায়ে। অতবড় দু'টো হীরে, আর তাতে ঐ রকম রঙের খেলা। মন্ত্রমুগ্ধের মতো শহরবাসীরা চেয়ে রইলো। সব প্রধান-প্রধান রাস্তা ঘুরে মিছিলটা রাজপ্রাসাদে এসে শেষ হলো। হীরে দু'টো রাখা হ'ল রাজার নিজস্ব যাদুঘরের বিরাট ঘরটায়। তার পাশেই রাখা আছে সেই বিখ্যাত 'সোনার ঘণ্টা।'

শুরু হ'ল ফ্রান্সিসের গৃহবন্দী জীবন। ওর বাবা যা বলেছিলেন, তাই করলেন। আট দশজন সৈন্য বাড়ির চারিদিকে ছড়িয়ে পাহারা দিতে লাগলো। ফ্রান্সিস হতাশ হ'ল। এবার আর পালানো যাবে না। ও ভাবতে লাগলো—পালাবার একটা উপায় বার করতেই হবে। প্রথমে যেতে হবে মরিটাস দ্বীপে। বসির আয়নাওলাকে খুঁজে বের করতেই হবে। একটা বিশেষ শক্তিশালী আয়না ওকে দিয়ে তৈরি করাতে হবে। তারপর চাঁদের দ্বীপ। লা ব্রুশের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে। তারপর মুক্তোর সমুদ্র থেকে মুক্তো সংগ্রহ। কিন্তু তার আগে বাড়ির এই বন্দীজীবন থেকে তো মুক্তি চাই। সেটা কি ক'রে হবে।

বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলতে পারলে একটা উপায় বার করা যেতো। কিন্তু বাবার স্পষ্ট হুকুম কাউকে বাড়িতে ঢুকতে দেওয়া হবে না। অতঃপর ফ্রান্সিস মা'কে বলল—'ঠিক আছে—আর কেউ না আসুক, অন্ততঃ হ্যারিকে এখানে আসতে দাও।'

মা বাবাকে বলল। দু'একবার আপত্তি ক'রে বাবা রাজি হলেন। বললেন—'হ্যারি একা আসতে পারবে।'

তাই হ'লো। হ্যারি দু'বেলাই আসে। ফ্রান্সিস এতেই খুশি। দু'জনেই নানা পালাবার ফন্দী-ফিকির ভাবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোনটাই কার্যকারী হবে ব'লে মনে হয় না।

কিছুদিন পরে একদিন সন্ধ্যাবেলা রাজবাড়ির একটি গাড়ি এসে ফ্রান্সিসদের বাড়ির সামনে দাঁড়ালো। গাড়িটা কালো কাঠের তৈরি। নানা সোনালি কারুকাজ সারাগাড়িটার গায়ে। ঘোড়া দুটোরও সাজের কতো ঘণ্টা। সবুজ-সাদা পোষাক পরা কোচ্‌ম্যান ফ্রান্সিসের সঙ্গে দেখা ক'রে একটা চিঠি দিল। মোটা কাগজে বাঁকা-বাঁকা হরফে লেখা। ওপরে কোন সম্বোধন নেই। শুধু লেখা— 'আপনি গল্প শোনাবেন বলেছিলেন। আজকে অবশ্যই আসবেন।' ইতি—মারিয়া

রাজকুমারী গাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছে। কাজেই সোজা কথা নয়। ফ্রান্সিসের না গিয়ে উপায় রইল না। মা ওকে সাজিয়ে-গুজিয়ে দিলো। রাজকুমারীর পাঠানো গাড়ি চড়ে ও রাজপ্রাসাদে গেল। বিরাট হলঘর পেরিয়ে টানা বারান্দা। তারপর কত ঘর। মেঝেটা শ্বেতপাথরে বাঁধানো। দেয়ালে, জানালায়, দরজায় সোনালি-রুপালি কাজ করা। একজন পরিচারক ফ্রান্সিসকে অন্দরমহলে নিয়ে এসেছিল, এক পরিচারিকার জিম্মায়। পরিচারি-কাটি ওকে রাজকুমারীর বসার ঘরে নিয়ে গেল। ছোটবেলায় ফ্রান্সিস অনেকবার বাবার সঙ্গে এসেছে। বড় হ'য়ে এই প্রথম এল। তখন যেমন অবাক চোখে তাকিয়ে সব দেখতো, আজও তেমনি অবাক চোখে দেখতে লাগলো চারিদিকের সাজসজ্জা, আলো, রঙ্।

রাজকুমারী ওর জন্যেই অপেক্ষা করছিলো। ও কাছে আসতে রাজকুমারী ডান হাতটা বাড়িয়ে ধরলো। ও সেই হাত চুম্বন করল। গদিমোড়া একটা সবুজ রঙের চেয়ার পরিচারিকাটি এগিয়ে দিল। ও তাতে বসল। রাজকুমারী মারিয়া হেসে বলল— 'কি খাবেন বলুন?'

'—আমি এইমাত্র খেয়ে এসেছি।' ফ্রান্সিস দ্রুত ব'লে উঠল।

'—তবু একটু ফলের রস খান।' রাজকুমারী পরিচারিকাটিকে ইঙ্গিত করলো। পরিচারিকাটি চ'লে গেল। একটু পরে শ্বেতপাথরের গ্লাসে ফলের রস নিয়ে এল। ওটা খাচ্ছে ও। তখনই রাজকুমারী বললো—'হীরে দুটো আনার গল্পটা বলুন।'

ফ্রান্সিস ফলের রস খেতে-খেতে গল্পটা শুরু করল—'গল্পটা প্রথম শুনেছিলাম মকবুলের মুখে, আমদাদের এক সরাইখানায়।'

ও গল্পটা ব'লে চললো। রাজকুমারী থুতনিতে আঙুল ঠেকিয়ে খুব মনোযোগ দিয়ে শুনতে লাগল গল্পটা। গল্প শেষ হতে রাজকুমারী অবাক হ'য়ে বললো— 'এত সব কাণ্ড করেছেন আপনি?'

ফ্রান্সিস কোন কথা বললো না। শুধু সলজ্জ মৃদু হাসলো। ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়িয়ে রাজকুমারীর হস্ত চুম্বন ক'রে বলল—'আজকে এই থাক্। আর একদিন আপনাকে 'মুক্তোর সমুদ্রে'র গল্প বলবো।'

'—আমিও আপনাকে আনতে গাড়ি পাঠাবো।' রাজকুমারী বললো।

ফ্রান্সিস মাথা নেড়ে বলল—'বেশ।'

সেই গাড়ি চড়েই ও বাড়ি ফিরে এল। গাড়ি চড়ে ফিরে আসতে-আসতেই একটা চিন্তা ওর মাথায় খেলে গেলো। রাজকুমারী তো আবার গাড়ি পাঠাবে। সেদিন এই চলন্ত গাড়ি থেকেই পালাতে হবে। এছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। বাড়ির ঐ কড়া পাহারা

থেকে পালাবারও কোন উপায় নেই। আবার রাজকুমারী কবে গাড়ি পাঠায় ও সেই আশায় রইল। এর মধ্যে ফ্রান্সিস বাবাকে বলল—'আমি রোজ কয়েক ঘণ্টার জন্যে সমুদ্রের ধারে যাবো।'

—'কেন?' বাবা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন।

—'মুক্তোর শিকারীরা কিভাবে মুক্তো তোলে, তাই দেখবো।'

—'বেশ যেতে পারো—কিন্তু তিনজন সৈন্যের পাহারায় যাবে।'

ফ্রান্সিস সম্মত হ'লো।

ফ্রান্সিস তিনজন সৈন্যের পাহারায় সমুদ্রের ধারে যেতে লাগলো। যে সব মুক্তো শিকারীরা শুধু কোমরে গোঁজা একটা মাত্র ছোরা নিয়ে জলে ডুব দিয়ে ঝিনুক তুলে আনে, তারপর ঝিনুক ভেঙে বা মুখ খুলে মুক্তো বের করে, ও তাদের সঙ্গে ক'দিনের মধ্যেই ভাব জমিয়ে ফেললো। ওরা কিভাবে ডুব দিয়ে, কিভাবে দ্রুত জল ঠেলে নামে, কিভাবে হাঙরের হাত থেকে আত্মরক্ষা করে, কিভাবে দম বেশিক্ষণ রাখে, ঐ সবকিছুই শিখে নিল। তারপর ওদের সঙ্গে জলে ডুব দিয়ে ঝিনুক আনতে লাগলো। দিন সাত-আটের মধ্যেই ও প্রায় পাকা মুক্তো শিকারী হ'য়ে গেল। এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি সময় জলের নীচে থাকতে শিখলো, দ্রুত জল কেটে নেমে যেতে, উঠে আসতে শিখলো। শিখলো কি ক'রে হাঙরের আক্রমণ ঠেকাতে হয়। ওরা শেখালো যে জলের নিচে কখনো হাঙরকে নীচে থাকতে দেবে না। তাহ'লেই হাঙরের হৃৎপিণ্ড লক্ষ্য ক'রে ছোরা চালানো সহজ। ফ্রান্সিস এভাবে দু'টো আক্রমণকারী হাঙরও মারলো। মুক্তো শিকারীরা খুব খুশি হ'ল। ও যে অল্পদিনেই প্রায় একজন পাকা মুক্তো শিকারী হ'য়ে গেছে, এ বিষয়ে ওদের মনে কোনো সন্দেহ রইলো না। ফ্রান্সিস চলে আসার দিন অনেক রাত পর্যন্ত মুক্তো শিকারীদের সঙ্গে রইলো। ওদের সঙ্গে সমুদ্রের ধারে রান্না-বান্না করলো, খাওয়া-দাওয়া করলো। তারপর ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে এলো।

পরের দিন সকালে হ্যারি ওর কাছে এলো। ও হ্যারিকে সমস্ত পরিকল্পনার কথা বলল। হ্যারি বলল—'তার চাইতে তুমি রাজকুমারীকেই বলো না—ও যেন রাজাকে বলে, তোমাকে একটা জাহাজ দেবার জন্যে।'

—'তা আমি বলতে পারি। রাজাও কোন আপত্তি করবেন না, জানি। কিন্তু মুস্কিল হ'য়েছে বাবা-মাকে নিয়ে। বাবা কিছুতেই রাজি হবেন না। কাজেই আমাকে লুকিয়ে থাকতে হবে, সুযোগ বুঝে আবার জাহাজ চুরি করে পালাতে হবে।'

হ্যারি আর কিছু বললো না, বুঝল ফ্রান্সিস ওর পরিকল্পনা পাল্টাবে না। যা ভেবেছে তাই করবেই।

দু'দিন পরে আবার সন্ধ্যের সময় রাজকুমারীর পাঠানো গাড়ি এল। ফ্রান্সিস যথারীতি সাজগোজ করল। বাড়ির বাইরে যাবার আগে মা'কে একবার জড়িয়ে ধরল। মা তো অবাক। জিজ্ঞেস করল—'কি হ'ল তোর? হঠাৎ এভাবে জড়িয়ে ধরলি।'

ফ্রান্সিস কোন কথা বলল না। ওর চোখে জল এসে গেছে। জানে কথা বললেই ওর অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠস্বর মা ধ'রে ফেলবে। মা'র মনে সন্দেহ হবে। কাজেই ও তাড়াতাড়ি মা'কে ছেড়ে দিয়ে গাড়িতে গিয়ে উঠে বসল।

মেঝের দামী-দামী কার্পেট পাতা, দরজা-জানালায় নানা কারুকাজ করা ঘরগুলো পেরিয়ে ও অন্দরমহলে রাজকুমারীর বসার ঘরে এলো। রাজকুমারী মারিয়া ওর জন্যেই অপেক্ষা করছিলো। ও 'মুক্তোর সমুদ্রে'র গল্প বলতে লাগলো, 'জলের নীচে মেঝের মত একটু এবড়ো-থেবড়ো জায়গায় কত মুক্তো ছড়িয়ে আছে। একটা নীলচে বেগুনী রঙের আলোয় জায়গাটা ভ'রে আছে। বীভৎস চেহারার লাফ্ মাছ পিঠের কাঁটাগুলো উঁচিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এরাই হচ্ছে মুক্তোর সমুদ্রের প্রহরী...।'

গল্প শেষ হ'তে রাজকুমারী বললো—'আপনি কি আবার মুক্তো আনতে যাবেন ?'

—'কেন ?' ফ্রান্সিস ভেঙে কিছু বললো না।

'—আমার লকেটের জন্যে একটা বড়ো মুক্তো আনবেন কিন্তু।'

ফ্রান্সিস হেসে মাথা ঝাঁকালো।

রাজবাড়ির গাড়ি চড়ে ও ফিরে আসছে। তখন রাত হ'য়েছে। রাস্তাঘাটে আঁধারি বাজারের কাছে গাড়ি, ঘোড়া, লোকজনের ভিড়। কোচ্ম্যান গাড়ির গতি কমালো। ফ্রান্সিস এই সুযোগের প্রতীক্ষাতেই ছিল। কোচ্মানের অজান্তে চলন্ত গাড়ির দরজা খুলে আস্তে-আস্তে রাস্তায় নেমে পড়ল। কোচ্ম্যান্ কিছু বুঝতেই পারল না। গাড়ি চালিয়ে সে আপনমনেই চলে গেল।

ফ্রান্সিস বিস্কোর বাড়ির দিকে চললো। ও জানে, ও পালিয়েছে জানলে বাবা প্রথমেই হ্যারির বাড়িতে খোঁজ নেবেন। কাজেই হ্যারিদের বাড়িতে থাকা চলবে না।

বিস্কোদের বাড়িতে যখন পৌঁছলো, তখন বেশ রাত হ'য়েছে। দোতলায় বিস্কো কোন ঘরে থাকে, ফ্রান্সিস জানতো। দেখলো সেই ঘরের জানালা অব্দি একটা মোটা লতাগাছ উঠে গেছে। কত ফুল ফুটে আছে সেই গাছটায়। ও দেওয়াল টপকে বাগানে ঢুকল। গাছের আড়ালে-আড়ালে চলে এলো জানালাটার নীচে। তারপর লতাগাছটা বেয়ে উঠতে লাগলো। নরম লতাগাছ। বেশি চাপ দিতে ভরসা হচ্ছে না। খুব সাবধানে লতাগাছটা বেয়ে ও জানালাটার কাছে এল। জানালায় কয়েকটা টোকা দিল। বিস্কো তখন শুয়ে পড়েছিল। জানালায় টোকা দেওয়ার শব্দ শুনে এসে জানালা খুলে দিল। অন্ধকারে ফ্রান্সিসকে চিনতে ওর অসুবিধে হ'ল, ও একটুক্ষণ অবাক হ'য়ে তাকিয়ে রইল। ফ্রান্সিস চাপাস্বরে বললো—'আমি ফ্রান্সিস।' বিস্কো চিনতে পেরে হাসলো। হাত বাড়িয়ে বললো '—কি ব্যাপারে এত রাত্রে এভাবে লুকিয়ে—।'

ফ্রান্সিস ওর বাড়ানো হাতটা ধ'রে লতাগাছটা থেকে জানালায় উঠে এলো। তারপর ঘরের মধ্যে নামলো। বিস্কো বিছানাটা দেখিয়ে বললে, 'বসো'।

ফ্রান্সিস বসলো। ওর পালাবার গল্প বললো। তারপর বললো, 'তোমাদের বাড়িতে দু-চারদিন আমাকে লুকিয়ে থাকতে হবে। আমার পালাবার খবর পেলেই বাবা আমার খোঁজে লোকজন পাঠাবেন। আমার প্রায় সব বন্ধুর বাড়িতেই বাবার পাঠানো লোকজন আমার খোঁজে আসবে। আমি জানি প্রথমেই খোঁজ হবে হ্যারিদের বাড়িতে। তারপর একে-একে সকলের বাড়ি।'

—'তুমি অনায়াসে আমাদের বাড়িতে লুকিয়ে থাকতে পারো। কেউ তোমার খোঁজ পাবে না। কিন্তু তুমি কি ভেবেছো, মানে তোমার পরিকল্পনাটা কি ?'

—'সব বন্ধুদের আবার একত্র করবো। রাজার জাহাজ চুরি ক'রে পালাবো। যাবো চাঁদের দ্বীপে। আবার মুক্তো আনবো।

এসব যাওয়ার পরিকল্পনা নিয়ে দু'জনে কথাবার্তা হ'ল অনেকক্ষণ, তারপর দু'জনে একই বিছানায় শুয়ে পড়লো। বাকি রাতটুকু ঘুমোল।

পরের দিন। ফ্রান্সিসের বাবা বুঝলেন, ফ্রান্সিস আবার পালিয়েছে। এবারের লক্ষ্য নিশ্চয়ই 'মুক্তোর সমুদ্র' থেকে মুক্তো আনা। কারণ ফ্রান্সিস মুক্তোর ব্যাপারে কি যেন বলেছিলো। ওর বাবা নিজেই এলেন হ্যারির বাড়িতে। হ্যারি সে সব শুনে আকাশ থেকে পড়লো। ও বললো গত দু'দিন যাবৎ ফ্রান্সিসের সঙ্গে তার দেখা নেই। সে জানেই না, যে ও পালিয়েছে। প্রায় সব বন্ধুদের বাড়িতে খোঁজ খবর ক'রে ফ্রান্সিসের বাবা হাল ছেড়ে দিলেন। ওর মা মুখে কিছু বললো না। আড়ালে কাঁদলো অনেকক্ষণ।

পরের কয়েকটা দিন ফ্রান্সিস বিস্কোর বাড়িতেই খেয়ে-ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিলো। তারপর বিস্কোকে পাঠালো হ্যারি আর অন্য বন্ধুদের খবর দিতে। রাত্রিবেলা যেন সবাই সেই পোড়ো বাড়িতে আসে। সভা হবে।

পোড়ো বাড়িটায় যখন ফ্রান্সিস এলো, তখন রাত হ'য়েছে। অনেক বন্ধু এসে গেছে। বাকিরা দু'জন একজন ক'রে আসতে লাগল। কিছু পরেই ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়ালো। বলতে লাগলো, 'ভাইসব, আমরা আবার সমুদ্রযাত্রা করবো। বাবার আপত্তি, কাজেই ইচ্ছে থাকলেও রাজা আমাদের জাহাজ দেবেন না। কাজেই সোজা রাস্তা জাহাজ চুরি। পরশুদিন এইসময় এইখানে সবাই তৈরি হয়ে হাজির থাকবে। রাত্রির অন্ধকারে জাহাজ চুরি ক'রে আমরা পালাবো'।

সবাই 'ও-হো-হো করে চীৎকার করে ফ্রান্সিসের প্রস্তাবে সম্মতি জানালো। সভা ভেঙে গেলো। নির্দিষ্ট দিনে ফ্রান্সিসের বন্ধুরা রাত একটু গভীর হ'তে পোড়ো বাড়িটায় জড়ো হ'তে লাগলো। সবাই সমুদ্রযাত্রার জন্যে তৈরি হয়ে এসেছে।

দল বেঁধে সবাই জাহাজঘাটায় এসে হাজির। জাহাজঘাটায় এখানে-ওখানে মশাল জ্বলছে। জলে সেই আলোর প্রতিবিম্ব কাঁপছে। খোলা তরোয়াল হাতে রাজার সৈন্যরা জাহাজ পাহারা দিচ্ছে। ফ্রান্সিস সবাইকে কেরোসিন কাঠের ভাঙ্গা বাক্স আর খড়ের গাদার পেছনে লুকিয়ে পড়তে বললো। পাথরের দেওয়াল আর থামের আড়ালে আড়ালে ফ্রান্সিস আর তার তিন-চারজন সঙ্গী পাহারাদার সৈন্যদের খুব কাছাকাছি চলে এলো। তারপর একটুক্ষণ অপেক্ষা ক'রেই সুযোগ বুঝে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। সৈন্য ক'জনকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলো। ফ্রান্সিস একটা মশাল নিয়ে খড়ের গাদা আর কেরোসিন কাঠের বাক্সের ওপর ছুঁড়ে দিলো। দাউ-দাউ করে আগুন জ্বলে উঠলো। অন্য পাহারাদারেরা ছুটে এলো। ওরা তাড়াতাড়ি কোমরে তরোয়াল গুঁজে বালতি নিয়ে সমুদ্র ঘাট থেকে জল তুলতে লাগল। আর আগুনে ছিটিয়ে দিতে লাগল। কিন্তু আগুন নিভলো না, বরং বেড়েই চললো। জাহাজে না আগুন লেগে যায়, এই জন্য ওরা ব্যস্ত হ'য়ে পড়ল। এই গোলমালের মধ্যে ফ্রান্সিস একটা ভালো দেখে জাহাজ লক্ষ্য করে, জাহাজঘাটা থেকে পাতা তক্তার ওপর দিয়ে ছুটলো, সঙ্গী কয়েকজনও ছুটলো। হাতে একটা মশাল নিয়ে ও জাহাজের ডেক-এর ওপর দাঁড়িয়ে নাড়তে লাগলো। জাহাজঘাটায়

লুকিয়ে থাকা বন্ধুরা দ্রুত ছুটে গিয়ে জাহাজটায় উঠলো। তাড়াতাড়ি নোঙর তুলে নিলো ওরা। একদল চলে গেল দাঁড়ঘরে। দাঁড় বাইতে লাগলো। জাহাজ মাঝসমুদ্রের দিকে এগিয়ে চললো। এতক্ষণে যে সৈন্যরা আগুন নেভাচ্ছিল, তারা দেখলো একটা জাহাজ মাঝসমুদ্রের দিকে ভেসে চলেছে। তখন অনেক দেরি হ'য়ে গেছে। জাহাজটাকে আর ফেরাবার উপায় নেই।

শান্ত সমুদ্রের বুকের ওপর দিয়ে জাহাজ চললো। দাঁড়ঘরে যারা দাঁড় বাইছিল, তারা বাদে প্রায় সবাই ডেকঘরে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়লো। ফ্রান্সিস আর হ্যারির চোখে ঘুম নেই। ওরা ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে কথাবার্তা বলতে লাগলো। ফ্রান্সিস বললো—'হ্যারি, আমাদের প্রথমেই খুঁজে বের করতে হবে মরিটাস দ্বীপটা কোথায়।'

—আন্দাজে কোথায় খুঁজে বেড়াবে ?

—আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ঐ দ্বীপ আছে পশ্চিম আফ্রিকার কাছাকাছি কোথাও, আর চাঁদের দ্বীপ থেকে বেশি দূরে নয়।

—কি ক'রে বুঝলে ?

—চাঁদের দ্বীপের রাজপুরোহিত যখন ওখানে মাঝে-মাঝে যেতো, তখন নিশ্চয় মরিটাস দ্বীপ চাঁদের দ্বীপেরই কাছাকাছি কোথাও আছে।

—তুমি কি মরিটাস দ্বীপে বসির আয়নাওলাকে খুঁজবে ?

—হ্যাঁ—খুঁজে বের করতেই হবে। ওর কাছ থেকে আয়না তৈরি করিয়ে নিতে হবে। নইলে 'মুক্তোর সমুদ্র' থেকে মুক্তো তোলা যাবে না।

—কিন্তু বসির আয়নাওলাকে কি করে খুঁজে বের করবে ?

—কত বড় আর হবে মরিটাস দ্বীপ। নিশ্চয়ই খুঁজে বের করতে পারবো।

কথা বলতে-বলতে ভোর হলো, রাত্রি জাগরণে ক্লান্ত ওরা ঘুমিয়ে পড়লো।

* * *

জাহাজ চলেছে। মাঝখানে এক সামুদ্রিক ঝড়ে ওদের জাহাজের দু'টো পাল ছিঁড়লো, হালেরও ক্ষতি হ'লো। ভূমধ্যসাগরের আশেপাশে বন্দরে জাহাজটাকে নোঙর করা হ'লো। পাল-হাল সারাই করা হ'লো। এসময়ে ফ্রান্সিস দেশী-বিদেশী জাহাজী নাবিকদের সঙ্গে গায়ে পড়ে ভাব জমাতে লাগলো। একটু কথাবার্তার পরেই ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করে, 'মরিটাস দ্বীপটা কোথায় বলতে পারেন ?' সকলেই মাথা নাড়ে-'উঁহু জানিনা, নামই শুনিনি কখনো।' শুধু একজন বৃদ্ধ নাবিক বলেছিল—'নাম শুনেছি, তবে সঠিক কোথায় বলতে পারবো না।' ফ্রান্সিসও হাল ছাড়লো না। যাকে পায়, যার সঙ্গে আলাপ হয়, তাকেই জিজ্ঞেস করে 'মরিটাস দ্বীপটা কোথায় জানেন ?'

কেউ বলতে পারে না। অবশেষে পশ্চিম আফ্রিকার তেকরুর বন্দরে ওদের জাহাজ ভিড়লো। তেকরুর বন্দর ফ্রান্সিসদের পরিচিত। এই বন্দর দিয়েই ওরা হীরে আনতে গিয়েছিলো। হীরে এনে এই বন্দর থেকেই ওরা দেশের দিকে যাত্রা শুরু করেছিলো। তেকরুর বন্দরে পাঁচ-ছ'টা ছোট-বড় বিদেশী জাহাজ নোঙর করা ছিলো। জাহাজ ফাঁকা ক'রে সব নাবিকরাই পারে নেমে এসেছিলো। হাজার হোক মাটির টান। যে ছোট হোটেলটা ওখানে ছিলো, সেখানে তিল ধারণের জায়গা নেই। ভীষণ ভীড় সেখানে।

সবাই খাচ্ছে-দাচ্ছে, আনন্দে হৈ-হল্লা করছে। ভাইকিংরাও হোটেলে খাওয়া-দাওয়া, আনন্দে-হুল্লোড়ে মেতে উঠলো। হ্যারি জাহাজ থেকে নামেনি। ওর শরীরটাও ভালো নেই। ফ্রান্সিস হোটেলে খেতে-খেতে যাকে সামনে পেলো, তাকেই মরিটাস দ্বীপের কথা জিজ্ঞেস করলো। সকলেই বললো, তারা জানে না। একজন বললো 'দক্ষিণদিকে কোথায় শুনেছি।'

হোটেলের ভেতরের হৈ-হট্টগোল আর ভালো লাগছিলো না।

ও বাইরে চ'লে এলো। দেখলো, হোটেলের কয়েকটা লোক রসুইঘরের কাছে কাকে মারছে। লোকটা চীৎকার করে কাঁদছে, আর ছেড়ে দেবার জন্যে কাকুতি-মিনতি করছে। ফ্রান্সিস জটলার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। নির্দয়ভাবে মার খাচ্ছে লোকটা। ওর সহ্য হ'লো না। লোকগুলোকে দু'হাতে সরিয়ে দিল ও। দেখলো লোকটা এমন মার খেয়েছে, যে উঠে দাঁড়াতে পারছে না। ও হোটেলে লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'কি হ'য়েছে'? লোকগুলোর মধ্যে থেকে একজন মোটামতো লোক এগিয়ে এসে বলল—'এটা চোর। প্রায় মাসখানেক হ'ল সুযোগ পেলেই রসুইঘরে ঢুকে খাবার চুরি ক'রে খায়। এর আগেও মার খেয়েছে। কিন্তু স্বভাব যায় নি। আজকে তাই ধ'রে আচ্ছামত দিলাম। আর কোনোদিন এদিকে আসবে না।'

ফ্রান্সিস নীচু হ'য়ে লোকটাকে তুলে দাঁড় করালো। তারপর ওকে ভীড় থেকে সরিয়ে নিয়ে আসবার সময় কিছু মুদ্রা মোটালোকটার হাতে গুঁজে দিলো। ওরা যে যার কাজে চলে গেলো।

ফ্রান্সিস লোকটাকে নিয়ে জাহাজঘাটার কাছে এল। এখানে একটা আলো জ্বলছিল। সেই আলোতে দেখলো লোকটাকে। বৃদ্ধই বলা যায়। হয়তো না খেয়ে থাকার জন্যেই লোকটাকে আরো শীর্ণ লাগছে দেখতে। ফ্রান্সিস ওর হাতে কয়েকটা পর্তুগীজ মুদ্রা দিলো। তারপর বললো—'তোমার নাম কি?'

—'চুকো।' লোকটা বুকে-পিঠে হাত বুলোতে-বুলোতে বললো।

—'তুমি চুরি করো কেন?'

'—কি করবো? বয়েস হ'য়েছে। জাহাজের ঐ অত খাটুনির কাজ করে পেরে উঠি না। তাই দিন কুড়ি আগে যে জাহাজে কাজ করতাম, তার ক্যাপ্টেন আমাকে এখানে ফেলে জাহাজ নিয়ে চ'লে গেছে। চুরি ক'রে খেতে পেয়েছি ব'লেই এখনো বেঁচে আছি, নইলে কবে ম'রে ভূত হ'য়ে যেতাম।' চুকো ভাঙা-ভাঙা গলায় বলল।

—'হুঁ'। ফ্রান্সিস একটু ভাবলো। মরিটাস দ্বীপের কথা একে জিজ্ঞেস ক'রে লাভ নেই। সেই একই উত্তর শুনতে হবে—'জানি না।'

তবু জিজ্ঞেস করলো—'এ দিকটায় তুমি কতবার এসেছো।'

—অনেকবার।

—চাঁদের দ্বীপ, ডাইনীর দ্বীপ চেনো এ'সব।

—ভালো ক'রেই চিনি।

—চাঁদের দ্বীপে কারা থাকে?

—যারা থাকে, ওদের বলে 'ভাজিম্বা।'

ফ্রান্সিস বেশ অবাক হ'লো। একটু আশান্বিত হয়ে ও জিজ্ঞেস করল—'মরিটাস দ্বীপ চেনো?'

—চিনি বৈকি।

ফ্রান্সিস চমকে উঠলো। লোকটা বলে কি! তবু একটু যাচাই ক'রে নিতে হয়। বললো—'মরিটাস দ্বীপটা কোথায় জানো?'

—চাঁদের দ্বীপের দক্ষিণ-পূর্বে।

ফ্রান্সিস যেন হাতে স্বর্গ পেল। তাহ'লে তো একে ছাড়া হবে না। জিজ্ঞেস করল—'ঐ দ্বীপে তুমি কখনো গেছো?'

—'আমার ভীষণ খিদে পেয়েছে।' চুকো পেছনে ফিরে হোটেলের দিকে হাঁটতে শুরু করল। ফ্রান্সিস ছুটে গিয়ে ওকে ধরলো। বললো—'চলো আমাদের জাহাজে। তোমাকে আজ পেট পুরে খাওয়াবো।'

চুকো ফিরে দাঁড়াল—'বেশ চলো।'

ফ্রান্সিস আর ওকে কোন প্রশ্ন করল না। একে পেট খিদেয় জ্বলছে, তার ওপর ঐ লোকগুলোর মার খেয়েছে। ও যে এখনো মাটিতে শুয়ে পড়েনি, এটাই আশ্চর্য। ও চুকোকে জাহাজে নিয়ে নিজের কেবিন ঘরে নিয়ে এলো। ভাইকিংরা যারা চুকোকে দেখলো, তারা বেশ অবাক হ'ল। ফ্রান্সিস আবার হাড়-হাভাতেটাকে কোত্থেকে ধ'রে নিয়ে এল? চুকোকে বসিয়ে ফ্রান্সিস ছুটলো হ্যারিকে ডাকতে। হন্তদন্ত হ'য়ে ওকে কেবিনঘরে ঢুকতে দেখে হ্যারি বেশ অবাক হ'ল। বললো—'কি হ'য়েছে?'

—'সে পরে বলবো, তুমি এখন শীগগির আমার ঘরে এসো।' হ্যারি উঠে দাঁড়ালো। নিজের কেবিনঘরের দিকে যেতে-যেতে ফ্রান্সিস বললো—'চুকো নামে একটা লোককে আমার ঘরে বসিয়ে রেখেছি। তুমি একথা সেকথা ব'লে নানা গল্প ফেঁদে ওকে আটকে রাখবে। সাবধান যেন ও পালাতে না পারে।'

নিজের কেবিনঘরে ঢুকে চুকোকে দেখিয়ে ফ্রান্সিস বলল—'হ্যারি, এর নাম চুকো। জাহাজে-জাহাজে বহু জায়গায় ঘুরেছে।' এবার চুকোর দিকে তাকিয়ে বলল—'চুকো, এ হ'ল হ্যারি, আমার প্রাণের বন্ধু। দু'জনে গল্প-টল্প কর।'

—'আমার খিদে পেয়েছে।' চুকো ভাঙাগলায় বলল।

—'আমি এক্ষুণি খাবার নিয়ে আসছি।' ফ্রান্সিস দ্রুত বেরিয়ে গেল। রসুইঘরে ঢুকে মাংস, রুটি যা হাতের কাছে পেলো থালায় তুলে নিল। ফিরে এসে দেখলো চুকো আর হ্যারি দু'জনেই চুপ ক'রে ব'সে আছে। হ্যারি দু'-হাত ছড়িয়ে হতাশার ভঙ্গী করলো। তার মানে চুকো এতক্ষণ একটি কথাও বলে নি। ফ্রান্সিস বুঝলো—সত্যিই ওর খিদে পেয়েছে। খাবারের থালা টেবিলের ওপর রেখে বললো—'চুকো—খেয়ে নাও।' চুকো যেন খাবারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। মিনিট দশ-পনেরো একনাগাড়ে খেয়ে গেল। একটা কথাও বললো না। খেতে-খেতে জল তেষ্টা পেয়েছে। কিন্তু সেটা বলতে গিয়ে মুখ দিয়ে শব্দ বেরুলো না। খাবারে গলা আটকে গেছে। হাতের ইশারায় জল দিতে বললো। ফ্রান্সিস তৈরিই ছিলো। তাড়াতাড়ি গ্লাসে জল নিয়ে এল। এক চুমুকে সবটা জল খেয়ে নিয়ে চুকো ঢেকুর তুলল। তারপর আস্তে-আস্তে খেতে লাগলো। ফ্রান্সিস একটু-

ক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বলল—'চুকো—এই জাহাজে থাকবে ?'

—'হুঁ।' শব্দ ক'রে চুকো ঘাড় নাড়ল। তারপর বললো—'কিন্তু কোন কাজ করতে পারবো না।'

ফ্রান্সিস তাড়াতাড়ি ব'লে উঠলো—'তোমাকে কিছু করতে হবে না।'

—'তাহ'লেই থাকা যাবে।'

ফ্রান্সিস আর কোন কথা বললো না। চুপ ক'রে চুকোর খাওয়া দেখতে লাগলো। একটুক্ষণের মধ্যেই মাংস-রুটি শেষ। চুকো ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে বললো—'আমার এখনো কিন্তু পেট ভরে নি।'

—'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই—' ফ্রান্সিস হ্যারির দিকে ইসারা ক'রে ছুটলো রসুইঘরের দিকে। আর একদফা মাংস-রুটি নিয়ে এল। চুকো আবার নিঃশব্দে খেতে লাগলো। এবার আরো আস্তে-আস্তে, খেতে লাগল। খাওয়া শেষ ক'রে ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে হাসলো। ফ্রান্সিসও কৃতার্থের হাসি হাসলো।

হাতমুখ ধুয়ে এসে চুকো বিছানায় চোখ বুঁজে আধশোয়া হ'ল। ফ্রান্সিস একটু সময় নিল। কি ভাবে কথাটা পাড়বে ভেবে নিলো। তারপর বলল—'চুকো—তুমি তো অনেক জায়গায় ঘুরেছো।'

চুকো চোখ বন্ধ ক'রেই তর্জনীটা ঘোরাল। তার মানে সমস্ত পৃথিবী।

—'তা হলে তো মরিটাস দ্বীপেও গেছো তুমি।'

—'দু'বার।' চোখ বন্ধ ক'রেই চুকো বলতে লাগল—'একবার দ্বীপে নেমেছিলাম, অন্যবার আর নামিনি। জাহাজেই ছিলাম।'

—'চুকো—আমাদের ঐ দ্বীপে নিয়ে যেতে হবে।'

—'সে অনেক ঝঞ্ঝাট্, দ্বীপটার চারদিকে আধডোবা প্রবালের স্তর। কোমর অবধি জল ঠেলে যেতে হয়। কোথাও গলা অবধি জল।'

—'জাহাজ থেকে নেমে হেঁটেই যাবো।' ফ্রান্সিস বললো। চুকো হাসলো—'আগুনের প্রবালে পা রাখলে পা জ্বালা করতে থাকবে, তাছাড়া এবড়ো-খেবড়ো রাস্তা, অসাবধান হ'লে পা কেটে দোফালা হ'য়ে যাবে।'

—'তবে ওখানকার লোকেরা যাতায়াত করে কি ক'রে ?'

—'ভাঁজিম্বাদের নৌকো দেখেছো, গাছের গুঁড়ি কুঁড়ে-কুঁড়ে তৈরি করে।'

—'হ্যাঁ দেখেছি।'

—'ঐ ডোঙা নৌকোয় চড়ে ঐ জায়গাটা পার হ'তে হয়।'

—'কতটা জায়গায় এই প্রবালের স্তর ?'

—'কোথাও এক মাইল, কোথাও দু'মাইল। তারপর দ্বীপের মাটি।'

ফ্রান্সিস একটুক্ষণ ভাবলো। তারপর বলল—'ওখানে আয়না কিনতে পাওয়া যায় ?'

—'আয়না তৈরিই তো মরিটাস দ্বীপের মানুষদের একমাত্র জীবিকা। ওখানকার বালি খুব মিহি। সোডা বা পটাশ পাহাড় এলাকায় প্রচুর। তাই দিয়ে খুব ভালো কাঁচ তৈরি হয়। লাল ভার্মিলিয়ন দিয়ে পারদ তৈরি ক'রে তাই দিয়ে নানারকম আয়না বানায় ওরা। দূর-দূর দেশের লোকেরা ওখানে আয়না কিনতেই জাহাজ ভেড়ায়।'

ফ্রান্সিস চুকোকে আর কোন কথা জিজ্ঞেস করলো না! জিজ্ঞেস করলেও চুকো আর কথা বলতো না। কারণ ও ততক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছে।

জাহাজ এবার চললো দক্ষিণমুখো। ফ্রান্সিস ভেবে দেখলো চাঁদের দ্বীপ হ'য়েই ওদের যেতে হবে। চাঁদের দ্বীপ থেকে ভাজিম্বাদের গুঁড়ি কাটা নৌকা নিতে হবে, যে ক'টা পাওয়া যায়। কথাটা ও হ্যারিকে বললো, ঐ নৌকো জোগাড় না ক'রে যাওয়া অর্থহীন। প্রবালের স্তর না পেরোতে পারলে ঐ দ্বীপেও যাওয়া যাবে না।

—'বুঝলে হ্যারি'—ফ্রান্সিস বলল—'মাহাবো সঠিক জানতো না, ওর বাবা সেই রাজপুরোহিত কিভাবে আয়না আনতো। আমার মনে হয়, ঐ রাজপুরোহিত ভাজিম্বাদের ডোঙা-নৌকা চড়েই মরিটাস দ্বীপে যেত। বসির আয়নাঅলাকে দিয়ে আয়না তৈরি করিয়ে ঐ ডোঙায় চড়েই ফিরে আসত। এটা ঐ রাজপুরোহিত খুব গোপনে করত।'

—'আমারও তাই মনে হয়।' হ্যারি মাথা নেড়ে বললো।

* * *

দিন পনেরো-কুড়ি কাটলো। খুব সাংঘাতিক ঝড়ের মুখে পড়তে হ'লো না ওদের। দু'-একদিন যা ঝড়বৃষ্টি হ'লো, তাতে ওদের কোনো ক্ষতি হ'ল না।

দূর থেকে দেখা গেলো ডাইনীর দ্বীপ। সেই সবুজ পাহাড় গাছ-গাছালি ঘেরা। চাঁদের দ্বীপ আর বেশি দূরে নেই।

দিন কয়েক পরেই ওরা চাঁদের দ্বীপের কাছে এলো। দূর থেকেই দেখা গেলো কালো কাঁচপাহাড়ের টানা এব্‌ড়ো-খেবড়ো প্রাচীর। তখন দুপুরবেলা। ফ্রান্সিস জাহাজ থামাতে বলল। রাত হ'লে তবে সোফালা বন্দরে জাহাজ ভেড়ানো হ'লো। ফ্রান্সিস হ্যারির সঙ্গে পরামর্শ করলো। বললো—'আমরা কেউ দ্বীপে নামবো না। আমাদের কাউকে দেখলে লা ব্রুশের দস্যুদলের লোকেরা চিনে ফেলতে পারে।'

—'এক কাজ করা যাক,' হ্যারি বলল, 'চুকোকে পাঠাও। ভাজিম্বাদের দু'-একটা নৌকো ও অনায়াসে বন্দরের ঘাট থেকে নিয়ে আসতে পারবে।'

—'আমিও চুকোকে পাঠাবার কথাই ভাবছিলাম।'

রাত হ'লো। ফ্রান্সিসরা আস্তে-আস্তে জাহাজটা সোফালা বন্দরের কাছে নিয়ে এলো। চুকোকে ডাকা হ'লো। কি করতে হবে, বলা হ'লো। চুকো মাথা নেড়ে বললো—'ওসব আমি পারবো না। সবে খেয়ে উঠেছি। আমার ঘুম পাচ্ছে।'

ফ্রান্সিসরা পড়ল মহা সমস্যায়। ওরা যতই চুকোকে বোঝায়, চুকো ততই মাথা নাড়ে আর বলে—'আমার এখন ভীষণ ঘুম পেয়েছে।'

এবার হ্যারি এগিয়ে এলো। চুকোর কাঁধে হাত রেখে হ্যারি ডাকল—'চুকো।'

—'হুঁ।' চুকো চোখ বুঁজে ঝিমুতে-ঝিমুতে বলল।

—তুমি একটা জাহাজের মালিক হতে চাও?

চুকো চোখ খুলে বড়-বড় চোখে হ্যারির দিকে তাকাল।

—'হ্যাঁ—' হ্যারি বলল—'যদি ডোঙা-নৌকো একটা এনে দিতে পারো—তুমি তার বদলে একটা জাহাজ পাবে।'

—'বাজে কথা।' চুকো আবার চোখ বুঁজল।

—'আচ্ছা—মুক্তোর সমুদ্রের নাম শুনেছো ?'

—'ওখানে গেলে কেউ ফেরে না।'

—'আমরা ওখান থেকে মুক্তো তুলে আনবো।' হ্যারি বললো।

—'তোমার মাথায় গোলমাল হ'য়েছে, ঘুমোতে যাও।' চুকো নিস্পৃহস্বরে বললো।

—'চুকো—আমার মাথা ঠিক আছে। তোমাকে আমরা হাঁসের ডিমের মত দুটো মুক্তো দেব।'

চুকো এবার চোখ তুলল। বলল—'মুক্তোর সমুদ্র থেকে মুক্তো আনতে পারবে ?'

—অনায়াসে পারবো, যদি তুমি একটা শুধু একটা নৌকো এনে দাও।

—তোমরা যাচ্ছো না কেন ?

—সে অনেক কথা। তোমাকে পরে বলবো। এখন এই কাজটুকু ক'রে দাও। তোমরা হচ্ছো স্পেন দেশের লোক। বীরের জাত সামান্য কাজটুকু পারবে না ?

হঠাৎ চুকো উঠে দাঁড়ালো। একবার চারপাশের দাঁড়ানো ভাইকিংদের দিকে তাকালো। জামাটা হাত দিয়ে ঝেড়ে নিল। ওর ভাবভঙ্গী দেখে অনেকেই আড়ালে হাসলো। হাসি সামলাতে অনেকে কেবিনঘরের বাইরে চলে গেল। চুকো গম্ভীর ভঙ্গীতে বললো—'একটা নৌকো নিয়ে আসা এ আর কি এমন কাজ।' ও দরজার দিকে এগোলো। হঠাৎ পেছন ফিরে বলল—'হ্যারি—আমাকে দু'টো মুক্তো দিতে হবে কিন্তু।'

—কথা যখন দিয়েছি নিশ্চয়ই দেবো। তুমি মুক্তো বিক্রী ক'রে জাহাজ কিনো।

চুকো বীরদর্পে বেরিয়ে গেলো। জাহাজ থেকে দড়ি বেয়ে-বেয়ে জলে নেমে গেল। তারপর সাঁতরে চললো সোফালা বন্দরের দিকে চারদিকে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। জাহাজের আলোগুলো নেভানো। ফ্রান্সিস আর হ্যারি ডেক-এ দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো।

কিছুক্ষণ পরেই অন্ধকারে জলভাঙার শব্দ উঠলো। অন্ধকারে ফ্রান্সিস ভালো ক'রে তাকিয়ে দেখলো দু'টো নৌকো আসছে। একটাতে ভূতের মত চুকো ব'সে আছে। ফ্রান্সিস চাপাস্বরে বললো—'চুকো—নৌকোদু'টো দড়ির সঙ্গে বেঁধে রাখো।'

নৌকো দু'টো জাহাজের ঝোলানো দড়ির সঙ্গে চুকো বেঁধে দিলো। তারপর উঠে এলো জাহাজের ডেক-এ। গম্ভীরচালে হেঁটে কেবিন-ঘরের দিকে চ'লে গেলো।

ফ্রান্সিস বন্ধুদের ডেকে বলল—আর এক মুহূর্তও এখানে থাকা নয়। এই অন্ধকারের মধ্যেই আমাদের পালাতে হবে। সবাই যে যার জায়গায় যাও। জাহাজ দক্ষিণমুখে চালাও।

নোঙর তোলা হ'লো। জাহাজ চললো দক্ষিণমুখো। কিন্তু মরিটাস দ্বীপ কি ঠিক দক্ষিণ দিকে ? সংশয় দেখা দিলো ফ্রান্সিসের মনে। ও কেবিনঘরে গিয়ে ঢুকলো। দেখলো চুকোর ভিজে জামাকাপড় পালটানো হয়ে গেছে। ও ঘুমোবার উদ্যোগ করছে। ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করলো—'চুকো- এখন আমরা কোনদিকে যাবো ?'

'দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে।' চুকো গম্ভীর ভঙ্গীতে বললো।

—মরিটাস দ্বীপে পৌঁছতে কতদিন লাগবে ?

—'হুঁ!' চুকো হেসে বললো—'কাল সকালেই পৌঁছে যাবো।'

সত্যিই তাই। পরদিন ভোর-ভোর সময়ে দূর থেকে মরিটাস দ্বীপ দেখা গেলো।

কাছাকাছি আসতে দেখা গেল দ্বীপটার একদিকে ন্যাড়া পাহাড়, পাথর, ধুলো-বালি। সবুজের চিহ্নমাত্র নেই। অন্যদিকে সবুজ ঘাসে ঢাকা পাহাড়, গাছগাছালি।

চুকোর নির্দেশমত এখন জাহাজ চলছে। প্রবালের স্তরের কাছাকাছি এসে চুকো হাত তুলে জাহাজ থামাবার নির্দেশ দিলো। চুকো ঠিকই বলেছিলো। জাহাজের কাছ থেকে তীর পর্যন্ত আগুনে-প্রবালের স্তর। জাহাজ থেকে সেই লাল প্রবাল স্তর স্বচ্ছ জলের মধ্যে দিয়ে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। এবড়ো-খেবড়ো লাল সবুজে রঙের প্রবাল স্তর বিস্তৃত। এই স্তরের কাছে আরো দু'টো জাহাজ নোঙর করা ছিলো। তার মধ্যে একটা জাহাজ ছোট ভাঙাচোরা। অন্য জাহাজটা নতুন। জলদস্যুদের ক্যারাভেল সেটা! তবে মাস্তুলের মাথায় কোন পতাকা উড়ছে না। কাজেই বোঝা যাচ্ছে না, ওটা অন্য কোন দেশের জাহাজ।

ফ্রান্সিস এসব দেখছিলো। চুকো ফ্রান্সিসের কাছে এলো। বললো—'একটা ভাঙা নৌকোয় মাত্র একজনই যাওয়া যাবে'।

—কেন? দু'তিনজন উঠলে কি হবে?

—নৌকো নীচের প্রবাল স্তরে আটকে যাবে।

কাজেই ফ্রান্সিস আর চুকো দড়ি বেয়ে-বেয়ে দু'টো নৌকায় নেমে এলো। তারপর দাঁড় বেয়ে দ্বীপের দিকে চললো। ফ্রান্সিস জলের দিকে তাকিয়ে দেখলো, স্বচ্ছ নীল, জলের মধ্যে দিয়ে প্রবালস্তর স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। কত বিচিত্র রকমের মাছের ঝাঁক ঘুরে বেড়াচ্ছে।

নৌকো দু'টো দ্বীপের মাটির কাছে এসে লাগলো। ফ্রান্সিস দেখলো ও'রকম আরো দুটো ডোঙা নৌকো তীরে বাঁধা রয়েছে। ওরা নৌকো দু'টো বেঁধে রেখে উঁচু-নীচু ধুলোটে পথ ধ'রে এগোতে লাগলো। একটু দূরেই বাজার দেখা গেল। সারি-সারি আয়নার দোকান। আয়না ছাড়াও রয়েছে নানা কারুকাজ করা গ্লাস, রেকাবি, জগ। ফ্রান্সিস পরপর কয়েকটা দোকানে জিজ্ঞেস করল—বসির আয়নাঅলার দোকান কোনটা? কিন্তু কেউই বলতে পারলো না। ওরা ঘোরাঘুরি করছে তখনই একজন লোক চুকোকে জড়িয়ে ধরলো। চুকো প্রথমে চমকে উঠলো। তারপর লোকটাকে দেখে স্প্যানিশ ভাষায় চেঁচিয়ে উঠলো—'আরে তুমি?' রাস্তার মধ্যেই দু'জনে গলা জড়াজড়ি ক'রে গল্পে মেতে উঠলো। ফ্রান্সিস তফাতে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলো। ওদের বকর্-বকর্ তখনও চলছে। ও বুঝলো, অনেকদিন পরে দুই বন্ধুর দেখা। ওদের কথা তাড়াতাড়ি ফুরোবে না। ফ্রান্সিস ডাকল—'চুকো—আমার ভীষণ তাড়া।' চুকো ব'লে উঠলো—'আমি আমার বন্ধুকে পেয়েছি। ওদের জাহাজেই যাবো। তোমাদের সঙ্গে যাবো না।'

ফ্রান্সিস হাসল—'কিন্তু তোমার পাওনা মুক্তো দুটো?'

—'হুঁঃ—' চুকো আবার হেসে বললো—'ভাজিম্বাদের প্রবাদ জানো তো—'যদি তুমি চিরদিনের জন্যে কোথাও যেতে চাও তাহ'লে মুক্তোর সমুদ্রে যাও।' তোমরা কোনোদিনই মুক্তো আনতে পারবে না'।

—'ঠিক আছে। তাহ'লে চলি চুকো—তুমি আমাদের অনেক উপকার করেছো। তোমার কাছে আমরা ঋণী রইলাম।'

ফ্রান্সিস এবার একাই এ দোকান ও দোকান ঘুরতে লাগলো। কিন্তু কেউই বসির আয়নাঅলার দোকান কোথায় ঠিক বলতে পারলো না।

ঘুরতে-ঘুরতে বেলা হ'লো। খিদেও পেয়েছে ভীষণ। ফ্রান্সিস ভাবলো জাহাজে ফিরে যাবে। বিকেলের দিকে আবার আসবে। কিন্তু কেমন একটা জেদ চেপে গেলো। বসির আয়নাঅলার হদিশ আজকেই খুঁজে বের করবো। জিজ্ঞেস করতে-করতে একজন বৃদ্ধ দোকানদার বললো, 'বসিরের কোন দোকান নেই। ও নিজের বাড়িতেই আয়না বানায় আর ওখান থেকেই বিক্রী করে।'

—ওর বাড়িটা কোথায় ?

—সোজা চলে যাও। একটা ন্যাড়া পাহাড়ের নীচে দেখবে পান্ডানাস গাছ। ওখানেই কোথাও ও থাকে।

হাঁটতে-হাঁটতে এসে ফ্রান্সিস পান্ডানাস গাছটা দেখতে পেলো। ওখানে দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক দেখছে, তখনই একটা দশ বারো বছরের ছেলে এসে ইসারায় জানতে চাইলো, ফ্রান্সিস কি চায়। ফ্রান্সিস আস্তে-আস্তে থেমে-থেমে বললো, বসির আয়নাঅলার বাড়ি। ছেলেটি মাথা ঝাঁকিয়ে হাতছানি দিয়ে ডাকল। ফ্রান্সিস ওর পেছনে-পেছনে একটা বাড়িতে ঢুকলো। ট্রাভেলার্স ট্রী'র কান্ড ডাল দিয়ে বাড়িটা তৈরি। ওপরটা পান্ডানাস গাছের পাতায় ছাওয়া। একটা ঘরের দিকে দেখিয়ে ছেলেটি চ'লে গেলো। ফ্রান্সিস দরজাটার কাছে গেলো। একটু ঠেলা দিতেই দরজাটা খুলে গেলো। ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে ডাকলো—'বসির, বসির।' কোন উত্তর এলো না। ও দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলো। ভেতরের অন্ধকারে কি একটা নড়ে উঠল, আর সঙ্গে-সঙ্গে মাথায় একটা আঘাত পেয়ে ফ্রান্সিস উবু হ'য়ে মেঝেয় পড়ে গেলো। পড়বার সঙ্গে-সঙ্গেই জ্ঞান হারালো।

যখন ওর জ্ঞান ফিরলো দেখলো, সেই ঘরের একটা খুঁটির সঙ্গে ওর হাতদু'টো বাঁধা। মাথায় অসহ্য ব্যথা। তাকিয়েই আবার চোখ বন্ধ করল।

—'হা—হা—হা—।' হাসির শব্দে ফ্রান্সিস চমকে তাকাল। দেখলো, খোলা তরোয়াল হাতে সামনে দাঁড়িয়ে লা ব্রুশের সেই ঢ্যাঙামত ছোট সর্দার।

—'জ্ঞান ফিরেছে তাহ'লে। হা-হা—আমি ভাবলাম তরোয়ালের হাতলের এক ঘায়েই বুঝি অক্কা পেলে।' ফ্রান্সিস কোন কথা বললো না। ঢ্যাঙা সর্দার বললো—'আমাদের জাহাজ পুড়িয়ে দিয়েছিলে। মুক্তো বিক্রী ক'রে লা ব্রুশ নতুন জাহাজ কিনেছে। আসার সময় নিশ্চয়ই সেটা চোখে পড়েছে।'

ফ্রান্সিসের মনে পড়লো আসার সময় একটা নতুন জাহাজ দেখেছিল। ও দুর্বলস্বরে বললো—'হ্যাঁ দেখেছি। কিন্তু তুমি এখানে কেন ?'

—'হা-হা—যে কারণে তুমি বসিরের কাছে এসেছো, আমিও সেই জন্যেই এসেছি।' কথাটা ব'লে ঢ্যাঙা সর্দার গলার কাছে হাত নিয়ে বললো—'এই দেখো বসিরের হাতে তৈরি আয়না। এটাই ওর হাতে তৈরি শেষ আয়না। ওকে আমি খতম ক'রে দিয়েছি।' ফ্রান্সিস দেখলো সেই ভাঙা আয়নার মত একটা আয়না ওর গলায় ঝুলছে। ও কোন কথা বললো না। মনে-মনে বললো—কি নির্মম এই জলদস্যুরা। ঢ্যাঙা সর্দার বলে উঠলো—'তোমাকেও খতম করতাম। কিন্তু এখনও সে সময় আসে নি।'

—'আয়নার কথা তোমরা জানলে কি করে?' ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করলো।

—'ভাজিম্বাদের সেনাপতি জঙ্গলের মধ্যে পাতা ফাঁদে ধরা পড়েছে। প্রাণের মায়া সকলেরই আছে। মেরে ফেলার ভয় দেখাতে ও যা জানে, সব বলেছে। রাজপুরোহিত মরিটাস দ্বীপে এসে বসির আয়নাঅলার কাছ থেকে আয়না বানিয়ে যেতো। তারপর মুক্তোর সমুদ্রে সে আয়না নিয়ে নামতো আর মুক্তো নিয়ে অক্ষতদেহে ফিরে আসতো। এটুকু আমরা তার কাছ থেকে জেনেছি। কিন্তু আয়নাটা কোন কাজে লাগতো, সেটা সেনাপতির জানা নেই। নানাভাবে আমরা সে কথা বের করবার চেষ্টা করেছি। শাস্তি-ঘরের কোন শাস্তিই বাদ দিইনি। শেষে বোঝা গেল আয়নাটা কি কাজে লাগতো, ও সত্যিই সেটা জানে না।' একটু থেমে ঢ্যাঙাসর্দার তরোয়ালের সরু মাথাটা ফ্রান্সিসের গলায় ঠেকালো। একটু চাপ দিয়ে বললো—'এবার তুমি বলো আয়নাটা কি কাজে লাগে। আমি তোমার জন্যেই এখানে এতক্ষণ অপেক্ষা করছিলাম।'

ফ্রান্সিস চুপ ক'রে রইলো। তরোয়ালের ডগার চাপ বাড়ল। ও ঢ্যাঙা সর্দারের চোখের দিকে তাকালো। কি নির্মম ভাবলেশহীন চোখ। বুঝলো, ওকে এই মুহূর্তে হত্যা করতে ঢ্যাঙা সর্দার বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ করবে না। ওর হাতও কাঁপবে না। ঢ্যাঙা সর্দার চেঁচিয়ে উঠলো—'বলো—নইলে মরো।'

চকিতে তরোয়ালটা শূন্যে উঠলো। ফ্রান্সিস ধীরস্বরে ব'লে চললো—'মুক্তোর সমুদ্রের প্রহরী লাফ্ মাছের আক্রমণের হাত থেকে বাঁচবার জন্যেই এই আয়না'।

তাতো বটেই, নইলে এখানে তোমার সঙ্গে মোলাকাৎ হবে কেন? কিন্তু বলো সেটা কিভাবে?

—'মুক্তোর সমুদ্রের নীচে—' ফ্রান্সিস অকম্পিতস্বরে বলতে লাগলো—'ঐ আয়না রাখলে লাফ্ মাছগুলো ঐ আয়নাটার প্রতিবিম্ব দেখে বিভ্রান্ত হয়। প্রাণপণে আয়নাটার ওপর ঢুঁ মারতে থাকে। মুখ ফেটে যায়, আয়নার কোণায় লেগে মুখ ফালা হ'য়ে যায়, তবু ওরা ঢুঁ মেরে চলে। সেই ফাঁকে মুক্তো তুলে নিতে হয়।'

—'তাহ'লে এই ব্যাপার।' ঢ্যাঙা সর্দারের মুখে খুশি যেন উপচে পড়ছে। বললো—'কত মুক্তো আছে ওখানে?'

—'যত মুক্তো আছে তা বিক্রী করে তোমার পরের চার পুরুষ পর্যন্ত কাউকে কিছু করতে হবে না। যে অর্থ তারা পাবে, দু'হাতে খরচ ক'রেও তা শেষ করতে পাবে না।

ঢ্যাঙা সর্দারের মুখ হাঁ হ'য়ে গেল। এত মুক্তো? ওর আর তর সইছিল না। ও কোমরে তরোয়াল গুঁজলো। বললো—'তোমার কাছে যা জানার জেনে নিয়েছি। তুমি আমাদের জাহাজ পুড়িয়ে দিয়েছিলে। আমিও এই বাড়িটায় আগুন লাগিয়ে দেবো। মর পুড়ে তুই'।

ঢ্যাঙা সর্দার ছুটে বাইরে চলে গেলো। একটু পরেই ঘরের কোণার দিকটা ধোঁয়ায় ভ'রে গেলো। তারপরেই দেখা গেলো আগুনের শিখা।

ফ্রান্সিস তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালো। চারদিকে তাকিয়ে দেখলো ছোট-বড় আয়না সাজানো। পা বাড়িয়ে দেখলো আয়নাগুলোর নাগাল পাওয়া যায়। অসহ্য যন্ত্রণায় মাথাটা ঝিমঝিম করছে। কিন্তু বাঁচতে হ'লে আর এক মুহূর্তও দেরি নয়। শরীরের সমস্ত

জোর নিয়ে ফ্রান্সিস আয়নাগুলোতে লাথি মারলো। চৌচির হ'য়ে ভেঙে আয়নার টুকরোগুলো চারিদিকে ছড়িয়ে গেলো। একটা ধারালো মুখওলা টুকরো ফ্রান্সিস পা দিয়ে টেনে-টেনে কাছে আনলো। তারপর ব'সে পড়ে অতিকষ্টে হাত বেঁকিয়ে টুকরোটা তুলে নিল। ঘরের একপাশের ট্রাভেলার্স ট্রীর কাণ্ড কেটে তৈরি বেড়া আগুনে পুড়ে ফুলকি তুলে ধপাস ক'রে পড়ে গেল। আগুন পাতায় ছাওয়া চালায় উঠে আসছে। ফ্রান্সিস কাঁচের টুকরোটা হাতে বাঁধা দড়িটায় ঘষতে লাগলো। কব্জি কেটে রক্ত পড়তে লাগলো। ফ্রান্সিস সব ব্যথা-যন্ত্রণা ভুলে একনাগাড়ে কাঁচটা ঘষতে লাগলো। দড়িটা কিছুটা কেটে যেতে এক হ্যাচ্‌কা টানে দড়িটা ছিঁড়ে ফেললো। ততক্ষণে মাথার ওপরের ছাউনিতে আগুন লেগে গেছে। বাইরে অনেক মানুষের চীৎকার, চেঁচামেচি কানে এলো। একবার দেখতে হয় বসির বেঁচে আছে কি না। ফ্রান্সিস দৌড়ে পেছনের ঘরে এল। দেখল, কম্বল পাতা বিছানায় শুভ্র দাড়ি-গোঁফঅলা এক বৃদ্ধ শুয়ে আছে। কাছে এসে দেখলো, একটা ছোরা তার বুকে আমূল বেঁধা। বুঝলো, বসির বেঁচে নেই। মাথার ওপর থেকে ছাউনির একটা অংশ সশব্দে ভেঙে পড়লো। আগুনের ফুলকি উড়ল। আর এক মুহূর্তও দেরি নয়। ফ্রান্সিস জ্বলন্ত দরজার মধ্যে দিয়ে এক লাফে বাইরে চ'লে এলো। দেখলো, অনেক লোক জড়ো হ'য়েছে। তারা জল ছিটিয়ে আগুন নেভাবার চেষ্টা করছে।

আগুন থেকে ফ্রান্সিসকে বেরিয়ে আসতে দেখে অনেকেই অবাক চোখে ওর দিকে তাকিয়ে রইলো। দু'একজন কিছু জিজ্ঞেস-টিজ্ঞেস করতে এগিয়ে এলো। ফ্রান্সিস কোনোদিকে তাকাল না। একছুটে রাস্তায় উঠে এলো। তারপর সমুদ্রতীর লক্ষ্য ক'রে জোরে ছুটতে লাগলো।

হাঁপাতে-হাঁপাতে সমুদ্রের তীরে এসে পৌঁছল ও। দেখলো, ওদের জাহাজ আর অন্য ভাঙাচোরা জাহাজটা দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু নতুন জাহাজটা নেই। ও আর এক মুহূর্তও দেরি করলো না। লাফিয়ে ডোঙা নৌকায় উঠলো! দ্রুত হাতে দাঁড় বেয়ে ওদের জাহাজের দিকে চললো।

ও যখন জাহাজে উঠলো, দেখলো ডেক-এর এখানে-ওখানে দল বেঁধে সবাই খেলায় মত্ত। ওর মধ্যে আবার নাচের আসরও বসেছে। ফ্রান্সিস চীৎকার ক'রে বলতে লাগল—'ভাইসব—এক্ষুণি পাল তুলে দাও—দাঁড়িরা দাঁড়ঘরে চলে যাও। আপ্রাণ চেষ্টায় জাহাজের যতটা গতি বাড়ানো সম্ভব বাড়াও। কেউ দেরি করবে না।'

সকলেই প্রথমে হকচকিয়ে গেল। কিন্তু পরক্ষণেই বুঝলো কিছু একটা হ'য়েছে। জাহাজের ডেক-এর মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে গেলো। একদল দাঁড়-দড়া ঠিক ক'রে পাল খুলে দিলো। গড়-গড় শব্দে নোঙর তোলা হ'ল। দাঁড়িরা দাঁড় টানতে শুরু করলো। একটা পাক খেয়ে জাহাজ চললো উত্তর-পূর্ব মুখো।

ফ্রান্সিস ডেক-এ দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে বলতে লাগলো—'কিছুক্ষণ আগে একটা নতুন জাহাজ নোঙর তুলে চলে গেছে, তোমরা নিশ্চয়ই দেখেছো। সেই জাহাজটায় আছে লা ব্রুশের ছোটো সর্দার। যেভাবেই হোক চাঁদের দ্বীপে পৌঁছবার আগেই ওটাকে সমুদ্রপথে ধরতে হবে! আমরা ভাইকিংরা নাকি জাহাজ চালাতে ওস্তাদ। আজকে তা' প্রমাণের সময় এসেছে। চূড়ান্ত গতিতে জাহাজ চালাও। ঐ জাহাজটাকে ধরা চাই-ই চাই।'

ডেক-এ যারা ছিল, তারা একসঙ্গে 'ও-হো-হো—'শব্দে ধ্বনি দিল। দাঁড়িঘর থেকেও ঐ ধ্বনি ভেসে এলো। জাহাজ দ্রুত বেগে জল কেটে ছুটল।

এতক্ষণে ফ্রান্সিসের শরীর জুড়ে অবসাদ নামলো। এতক্ষণ মাথায় তরোয়ালের হাতলের ঘা-এর ব্যথা ভুলে ছিল। তার ওপর সারাদিন এক ফোঁটা জলও পায় নি। ও গিয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেবার জন্যে বিছানায় শুয়ে পড়ল। হ্যারি ওর কাছে এলো। কথা বলতে-বলতে লক্ষ্য করলো ফ্রান্সিসের মাথার পেছনদিকের চুলে জমাট রক্তের জট, ঘাড়ে শুকিয়ে যাওয়া রক্তের দাগ। দু'হাতের কব্জিতে কালচে রক্তের দাগ। হ্যারি ব'লে উঠলো, 'ফ্রান্সিস এসব কি?'

ফ্রান্সিস ক্লান্তভাবে একটু হাসলো। তারপর সব ঘটনা বললো। ওদের মধ্যে যে ওষুধ-টষুধ দে', হ্যারি তাকে ডেকে পাঠাল। ফ্রান্সিসের মাথা ভালো ক'রে জল দিয়ে ধুয়ে সেই লোকটা ওষুধ লাগিয়ে দিল। ব্যথা একটু কমলো। ফ্রান্সিস আস্তে-আস্তে খাবার ঘরে গিয়ে ঢুকলো। পেট পুরে খেলো। তারপর একটু বিশ্রাম ক'রে নিলো। পরে হ্যারিকে ডেকে নিয়ে জাহাজের ডেক-এ এসে দাঁড়ালো। বেশ ভালো গতিতেই জাহাজ চলছে।

রাত বাড়তে লাগলো। ছোট সর্দারের ক্যারাভেল জাহাজের দেখা নেই। ফ্রান্সিস ডেক-এ পায়চারি করে। কখনো দিগন্তের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। হ্যারিও ওর পাশে দাঁড়িয়ে থাকে। জাহাজে কারো চোখেই ঘুম নেই। দাঁড়িরা প্রাণপণে দাঁড় বাইছে। দু'তিনজন মাস্তুলে উঠে বসে আছে। দড়ি-দড়া টেনে পালগুলো যাতে বেশি বাতাস পায়, তার জন্যে চেষ্টা করছে। জাহাজটা যেন উড়ে চলেছে, এমনি তার গতিবেগ।

হঠাৎ মাস্তুলের ওপর থেকে একজন চেঁচিয়ে ফ্রান্সিসকে ডাকলো। ফ্রান্সিস আর হ্যারি মাস্তুলের কাছে ছুটে এলো। লোকটা বললো—'জলদস্যুদের ক্যারাভেলটা দেখা যাচ্ছে। ওটার চেয়ে অনেক বেশি গতিতে আমাদের জাহাজ যাচ্ছে।'

ফ্রান্সিস দিগন্তের দিকে তাকালো। অন্ধকারে অস্পষ্ট ছায়ার মত ক্যারাভেল-এর পালগুলো নজরে পড়ল। ফ্রান্সিস চেঁচিয়ে বললো—'জাহাজের সব আলো নিভিয়ে দাও। কেউ কোন শব্দ করবে না। আমরা অন্ধকারে ক্যারাভেল-টার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বো।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই ফ্রান্সিসদের জাহাজ ক্যারাভেল-এর অনেক কাছে চ'লে এলো। কিন্তু ছোট সর্দারও কম চালাক নয়। ও জানতো যে ফ্রান্সিস নিশ্চয়ই ওদেরই পেছনে ধাওয়া ক'রে আসবে। ওরাও সজাগ ছিলো। সেটা বোঝা গেলো, যখন ক্যারাভেল থেকে কামান দাগা শুরু হ'ল। অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে কামানের আগুনের গোলা ফ্রান্সিসদের জাহাজ লক্ষ্য ক'রে ছুটে এলো। কপাল ভালো। গোলাটা জাহাজ পার হ'য়ে সমুদ্রের জলে পড়ল। হ্যারি বলল—'ফ্রান্সিস ওরা টের পেয়েছে। জাহাজের গতি কমাও। জাহাজ সরিয়ে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই।'

—'না—'ফ্রান্সিস বলল—'ওদের লোকসংখ্যা কম। সর্দার বেশি লোক নিয়ে আসেনি। যদি ওদের দাঁড়ির সংখ্যা বেশি থাকতো, তাহ'লে এত তাড়াতাড়ি ওদের ধরতে পারতাম না।'

—'কিন্তু কামানের গোলার মুখে আমরা কি ক'রে এগোবো ?' হ্যারি বললো ।

ওরা কথা বলছে, তখনই আর একটা কামানের গোলা ছুটে এলো ! ওদের জাহাজের হালের কাছে এসে পড়লো ওটা । হালের ওদিকটা ভেঙে তছনছ হ'য়ে গেলো । হ্যারি চেঁচিয়ে উঠল—'ফ্রান্সিস, জাহাজ ফেরাও ।'

—'না ।' ফ্রান্সিস বললো—যদি জাহাজে আগুন লাগে, তবু আমরা এগিয়ে যাবো ।' আর একটা গোলা এসে জাহাজটার পেটের কাছে লাগলো । ওই জায়গাটার কাঠ ভেঙে একটা খোঁদল হ'য়ে গেলো । আর একটা গোলা এসে মাস্তুলের ওপর পড়লো । পালে আগুন লেগে গেলো । মাস্তুলের ওপর যে ভাইকিংটি ছিলো, সে ছিট্‌কে জলে পড়ে গেলো । দাঁড়িরা কিন্তু টেনে চললো । পাল থেকে আগুন ছড়ালো । আস্তে-আস্তে ডেক-এও আগুন লেগে গেলো । ততক্ষণে ফ্রান্সিসদের জাহাজটা ক্যারাভেল-এর অনেক কাছে চলে এসেছে । আবার একটা গোলা এসে ডেক-এ পড়লো । আগুন আরো ছড়িয়ে পড়লো । ফ্রান্সিস এতক্ষণ একটি কথাও বলে নি । শুধু দেখছিল ক্যারাভেলটা কত দূরে ।

এবার ফ্রান্সিস হ্যারির দিকে ফিরে বললো—'শীগ্‌গির দাঁড়িদের উঠে আসতে বলো ।' হ্যারি ছুটল ওদের ডেকে আনতে । কিছুক্ষণের মধ্যেই সবাই তরোয়াল নিয়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে । ঐ ক্যারাভেল-এ উঠে লড়াই শুরু হবে ।' ঠিক তখনই গোলা ছুটে আসছে দেখা গেলো । একসঙ্গে সবাই চীৎকার ক'রে উঠল 'ও-হো-হো' । তারপরই সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়লো । গোলাটাও এসে ডেক-এর ওপর পড়লো । এক মুহূর্তের ব্যবধানে ওরা বেঁচে গেলো । দাঁতে তরোয়াল চেপে সবাই সাঁতরে চললো ক্যারাভেলটার দিকে । ওদিকে ফ্রান্সিসদের জাহাজটায় তখন অগ্নিকুণ্ডের সৃষ্টি হ'য়েছে । দাউ-দাউ করে জ্বলছে জাহাজটা । ঐ আগুনের আভায় চারদিক আলোকিত হ'য়ে গেল ।

ক্যারাভেল-এর গা থেকে যে দড়িদড়া ঝুলছিলো, ভাইকিংরা সাঁতরে এসে তাই বেয়ে উঠতে লাগলো । দু'তিনজন জাহাজের ডেক-এ ওঠার চেষ্টা করল । কিন্তু পারলো না । জলদস্যুদের তরোয়ালের ঘায়ে কয়েকজনের মৃত্যু হ'লো । ফ্রান্সিস বুঝলো—এভাবে ওঠা যাবে না । ও তখন পেছনের হালের কাঠের খাঁজে-খাঁজে পা রেখে-রেখে নিঃশব্দে ডেক-এর ওপর উঠে এলো । দেখলো আট-দশজন জলদস্যু জাহাজের রেলিং ধ'রে ঝুঁকে নীচে জলের দিকে তাকিয়ে আছে । ওদের হাতে খোলা তরোয়াল । ফ্রান্সিস দ্রুতপায়ে ছুটে গিয়ে পরপর দু'জনের পিঠে তরোয়াল ঢুকিয়ে দিলো । অন্য দস্যুরা ঘুরে দাঁড়িয়ে একসঙ্গে ফ্রান্সিসকে আক্রমণ করুক, এটাই সে চাইছিলো । ও নিপুণ হাতে তরোয়াল চালিয়ে ওদের আটকে রাখলো । সেই ফাঁকে ভাইকিংরা দড়ি বেয়ে-বেয়ে ক্যারাভেল-এর ডেক-এ উঠে এলো । শুরু হলো তরোয়ালের লড়াই । জলদস্যুরা দু'-একজন মারা পড়তেই বাকিরা প্রাণ বাঁচাতে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়লো ।

ফ্রান্সিস চারদিকে তাকিয়ে কোথাও সেই ঢ্যাঙা ছোট সর্দারকে দেখতে পেল না । কোথায় গেলো ছোট সর্দার ? ও দ্রুতপায়ে ছুটলো নিচে কেবিনঘরের দিকে । সব কেবিনঘর ফাঁকা । রসুইঘর, ভাঁড়ারঘর, কয়েদঘর কোথাও ঢ্যাঙা সর্দার নেই । ও ওপরে ডেক-এ উঠে এলো । রেলিঙে ভর দিয়ে সমুদ্রের দিকে তাকালো । ওদের জাহাজের

আগুনের আভায় দেখলো, একটা ডোঙা-নৌকো ভেসে চলেছে। একটা লোক ডোঙা-নৌকাটা দাঁড় দিয়ে বাইছে। নিশ্চয়ই ঢ্যাঙা ছোট সর্দার। নৌকায় চড়ে পালাচ্ছে।

ফ্রান্সিস এক মুহূর্তও দেরী করলো না। তরোয়ালটা দাঁতে চেপে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়লো। ঐ ডোঙা-নৌকোটা লক্ষ্য ক'রে প্রাণপণে সাঁতার কাটতে লাগলো। ডোঙা-নৌকাটা উঁচু-উঁচু ঢেউয়ের ধাক্কায় বেশিদূর যেতে পারল না। ফ্রান্সিস অল্পক্ষণের মধ্যেই নৌকোটার কাছে পৌঁছে গেলো; সত্যিই ঢ্যাঙা ছোট সর্দার। ফ্রান্সিসকে দেখতে পেল ও। সঙ্গে-সঙ্গে দাঁড় ফেলে কোমর থেকে তরোয়াল খুললো। নৌকোর ওপর থেকে ফ্রান্সিসকে লক্ষ্য ক'রে তরোয়াল চালালো। ফ্রান্সিস স'রে এলো দ্রুত। কিন্তু ততক্ষণে তরোয়ালের ফলাটা ওর বুক ছুঁয়ে গেছে। জামা কেটে গেলো। বুকের অনেকটা জায়গা লম্বালম্বি কেটে গেছে। রক্ত বেরোচ্ছে। ফ্রান্সিস বুঝলো, নৌকোর কাছে গিয়ে ওকে আক্রমণ করা যাবে না। ওকে অন্য উপায়ে মারতে হবে। ফ্রান্সিস তরোয়ালটা দাঁতে চেপে ডুব দিল। ঢ্যাঙা সর্দার নৌকার ওপর দাঁড়িয়ে তরোয়াল উঁচিয়ে চারদিকে জলে তাকাতে লাগলো। কখন ফ্রান্সিস ভেসে ওঠে। ফ্রান্সিস তরোয়ালটা হাতে নিয়ে নৌকাটার এক হাতের মধ্যে হঠাৎ ভেসে উঠলো। ঢ্যাঙা সর্দার তরোয়ালটা চালাবার আগেই ফ্রান্সিস ওর তরোয়ালের বাঁটটা বর্শার মত ধ'রে দেহের সমস্ত শক্তি একত্র ক'রে ওর বুক লক্ষ্য ক'রে ছুঁড়লো। আর সঙ্গে-সঙ্গে ডুব দিলো। তরোয়াল সোজা ঢ্যাঙা সর্দারের বুকে গিয়ে বিঁধে গেল। ঢ্যাঙা সর্দার নিজের তরোয়াল ফেলে দিয়ে বুকে বেঁধা তরোয়ালটা দু'হাতে টেনে বার করবার চেষ্টা করলো। কিন্তু পারলো না। হাঁটুমুড়ে পড়ে গেল। তরোয়ালটা টেনে খোলার জন্যে বার কয়েক নিস্ফল চেষ্টা করলো। তারপর শুয়ে পড়ে কয়েকবার হাত-পা ছুঁড়তে-ছুঁড়তে স্থির হ'য়ে গেলো।

ফ্রান্সিস নৌকাটায় উঠলো। নৌকাটা জোরে দুলে উঠলো। ও ঢ্যাঙা সর্দারের গলা থেকে আয়নাটা খুলে নিলো। তখনই হঠাৎ একটা বড় ঢেউয়ের ধাক্কায় নৌকাটা কাত হ'য়ে গেলো। ফ্রান্সিস দু'হাতে জল ঠেলে-ঠেলে ক্যারাভেল-এর দিকে সাঁতরাতে লাগলো।

দড়ি বেয়ে-বেয়ে ক্যারাভেল-এ উঠলো। মাথার তীব্র যন্ত্রণাটা এতক্ষণে অনুভব করলো। সমস্ত শরীর জুড়ে অসহ্য ক্লান্তি। চোখের সামনে সব কেমন ঝাপসা হ'য়ে এলো। হ্যারি ছুটে এসে ওকে ধরলো। ফ্রান্সিসের শরীরে আর একফোঁটা শক্তি নেই। ও শরীর ছেড়ে দিলো। কয়েকজন ভাইকিং ছুটে এল। সবাই ধরাধরি ক'রে ফ্রান্সিসকে ওর কেবিনঘরে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিলো। বৈদ্যিকে ডাকা হ'লো। সে এসে ফ্রান্সিসের মাথায় ওষুধ লাগিয়ে দিলো। ব্যথার তীব্রতা একটু কমলো বটে, যা হোক ফ্রান্সিস ঘুমিয়ে পড়লো। আয়নাটা তখনও ওর হাতে ধরা। হ্যারি হাত থেকে আয়নাটা নিয়ে ওর শিয়রের কাছে রেখে দিলো।

* * *

সকাল হ'লো। ভাইকিংরা সকলেই খুব খুশি। একটা ঝকঝকে নতুন জাহাজ পাওয়া গেছে। রাত্রে ভালো ক'রে দেখা হয় নি। এখন সবাই ঘুরে-ঘুরে ক্যারাভেলটা দেখতে লাগলো। সত্যিই ক্যারাভেলটা সুন্দর। ভালো জাতের কাঠে তৈরি।

ফ্রান্সিসের ঘুম ভাঙলো। মাথার ব্যথাটা অনেক কমেছে। আবার বৈদ্যি এসে ওষুধ

দিয়ে গেলো। ও শিয়রের কাছ থেকে আয়নাটা এনে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখতে লাগলো। ঠিক ফ্রেদারিকোর সেই আয়নার মত কাটা। নীচে ছিদ্র। হ্যারি ঘরে ঢুকলো। বললো 'কি হে কেমন আছো ?'

ফ্রান্সিস হাসলো—'এখন অনেকটা ভালো।'

—কি করবে এবার ভেবেছো কিছু ?

—হুঁ। ভেবেছি জাহাজটা দু'দিন এখানেই থাকবে। আমি ভীষণ ক্লান্ত। দু'টো দিন বিশ্রাম চাই। তারপর চাঁদের দ্বীপে—লা ব্রুশের সঙ্গে মোকাবিলা।

পরের দু'দিন জাহাজ ওখানেই থেমে রইলো। পাল নামিয়ে রাখা হ'লো। জাহাজের কোন কাজ নেই। বেশ একটা ছুটির আবহাওয়া। সবাই ডেক-এর এখানে-ওখানে জটলা বাঁধলো। কোথাও ছক্কাপাঞ্জা খেলা চললো, কোথাও মোটা ভারি গলায় গান চললো, কোথাও দেশের বাড়ির গল্পগাছা চললো।

দু'দিন পরে সন্ধ্যেবেলা আবার সাজ-সাজ রব। একদল উঠলো মাস্তুলে। একদল পাল বাঁধলো, একদল চলে গেল দাঁড়ঘরে! জাহাজ চললো চাঁদের দ্বীপ লক্ষ্য ক'রে।

সোফালা বন্দরে গিয়ে জাহাজটা যখন নোঙর করল, তখন গভীর রাত্রি। যে ক'টা ডোঙা-নৌকা জাহাজটার সঙ্গে বাঁধা ছিল, সেই নৌকোয় চড়ে দফায় ভাইকিংরা সবাই সমুদ্র-তীরে গিয়ে সারি বেঁধে দাঁড়ালো।

আকাশে ভাঙা চাঁদ। অল্প জোৎস্নায় ভূতের মতো দাঁড়িয়ে আছে গুদোমঘর, নির্জন বাজার পেরিয়ে সবাই রাজবাড়ির দিকে চললো।

রাজবাড়ির কাছে পোঁছে অল্প চাঁদের আলোয় দেখলো দু'জন জলদস্যু খোলা তরোয়াল হাতে। রাজবাড়ি পাহারা দিচ্ছে। এখানে-ওখানে মশাল জ্বলছে। ফ্রান্সিস নিম্নস্বরে বলল—আমি আর হ্যারি ঐ দু'টোকে ঘায়েল করছি। তারপর আমি ইসারা করলেই সবাই রাজবাড়ির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।

ফ্রান্সিস আর হ্যারি ঘরের আড়ালে-আড়ালে পাহারাদার দুই জলদস্যুদের কাছাকাছি চ'লে এলো। তারপর সুযোগবুঝে দু'জনে একসঙ্গে পাহারাদার দু'জনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। গলা চেপে ধ'রে দু'জনকেই মাটিতে ফেলে দিলো। হ্যারি একজন পাহারাদারের বুকে সোজা তরোয়াল চালিয়ে দিল। অল্প গোঙানি বেরুলো ওর গলা থেকে। ফ্রান্সিস অন্যটাকে তরোয়ালের বাঁট দিয়ে মাথায় মারলো। জলদস্যুটা জ্ঞান হারালো। ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়িয়ে তরোয়াল তুলে আক্রমণের ইঙ্গিত করলো।

'ও—হো—হো—' প্রচণ্ড চীৎকারে রাত্রির আকাশকে বিদীর্ণ ক'রে ভাইকিংরা রাজ-বাড়ির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। ঘুমন্ত জলদস্যুর দল আচমকা এই আক্রমণে বিছানা ছেড়ে ওঠারও সময় পেল না। দু'একজন অন্ধকারে বাইরে ছুটে এলো। তারপর ধরবার আগেই গা ঢাকা দিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই বাকি সব ক'জন জলদস্যুকে বন্দী করা হ'ল। ওদের রাখা হ'ল শাস্তিঘরে।

এর মধ্যে ফ্রান্সিস বেন্জামিনকে খুঁজল। কিন্তু কোন ঘরেই তাকে পেলো না। বারান্দায় নেই, বাইরের চত্বরেও নেই। বুঝলো, লা ব্রুশ ওকে মেরে ফেলেছে। ফ্রান্সিস ছুটলো, দরবার ঘরের মধ্যে দিয়ে ভেতরের অন্দরমহলে।

অন্দরমহলের ঘরে তখন লা ব্রুশ চীৎকার-চ্যাঁচামেচিতে ঘুম ভেঙে সবে উঠে বসেছে। তাড়াতাড়ি পিস্তল নিয়ে ঘরের বাইরে আসতে যাবে, তখনই দরজার মুখে একেবারে ফ্রান্সিসের মুখোমুখি। লা ব্রুশ পিস্তল তুললো। ফ্রান্সিস তার আগেই দ্রুত বসে পড়লো। গুলি ছুটে গিয়ে দরজাটায় লাগলো। ফ্রান্সিস আর দ্বিতীয়বার গুলি চালাবার সময় দিলো না। লা ব্রুশের পিস্তল ধরা হাত লক্ষ্য ক'রে বিদ্যুৎবেগে তরোয়াল চালালো। আঙ্গুল কেটে গেলো। পিস্তলটাও ছিট্‌কে পড়লো। লা ব্রুশ বিছানার পাশে রাখা হাতীর দাঁতের বাটঅলা তরোয়ালের দিকে হাত বাড়ালো। কিন্তু কাটা আঙ্গুল নিয়ে তরোয়ালটা তুলতে পারলো না। ফ্রান্সিস তৎক্ষণে দ্রুতহাতে তরোয়ালটা ওর বুকে আমূল বিঁধিয়ে দিল। মুখ দিয়ে একটা কাতর শব্দ বেরিয়ে এল। দু'তিনবার এপাশ-ওপাশ ক'রে লা ব্রুশ বিছানার ওপর পড়ে গেলো। ওর শরীরটা স্থির হ'য়ে গেল।

ফ্রান্সিস তখন হাঁপাচ্ছে। হ্যারি সঙ্গে আর কয়েকজন ভাইকিং ছুটে ঘরে ঢুকলো। দেখল লা ব্রুশের মৃত শরীরটা পড়ে আছে। ওরা আনন্দে চীৎকার ক'রে উঠল—'ও—হো—হো—।' বাইরের উঠোন থেকে, বারান্দা থেকে অন্য সব ভাইকিংরা চীৎকার ক'রে সাড়া দিল। অর্থাৎ যুদ্ধে জয় হয়েছে।

দরবার কক্ষে গিয়ে ফ্রান্সিস বসলো। একটু পরে কয়েকজন ভাইকিং ভাজিম্বা সেনাপতিকে নিয়ে এল। সেনাপতিকে ওরা শাস্তিঘর থেকে ধ'রে নিয়ে এলো। সেনা-পতির হাঁটবার ক্ষমতাও লোপ পেয়েছে। তাব সারা শরীরে আগুন দিয়ে ছ্যাঁকা দেওয়ার দাগ। চোখ দু'টো কোটরে বসা। ফ্রান্সিস তাড়াতাড়ি উঠে সেনাপতিকে বললো 'আপনি জেনে খুশি হবেন অত্যাচারী লা ব্রুশ মারা গেছে। ওর ছোটো সর্দারও মারা গেছে। অন্য সঙ্গীরা অনেকেই বন্দী, কিছু অন্ধকারে পালিয়েছে।' সেনাপতি কথাগুলো শুনলো। একটু হাসি ফুটলো তার মুখে।

—'আপনি দিন কয়েক খাওয়া-দাওয়া করুন, বিশ্রাম করুন, তারপরে আপনাকে নিয়ে বনে-পাহাড়ে যাবো। রাজা, মন্ত্রী আর সব ভাজিম্বাদের ফিরিয়ে আনবো। আপনাদের চাঁদের দ্বীপ আপনাদের হাতেই ফিরিয়ে দিয়ে আমরা চলে যাবো।' ফ্রান্সিস বললো।

পরের কয়েকদিন ভাইকিংরা খুব আনন্দেই কাটালো। কাজকর্ম কিছু নেই। শুধু খাও-দাও ঘুমাও। পালা ক'রে—শুধু শাস্তিঘর পাহারা দেওয়া।

দরবার কক্ষ, অন্দরমহল সব খোঁজা হ'লো। অন্দরমহলে যে ঘরে লা ব্রুশ থাকত সেই ঘরে। একটা কারুকার্য করা কাঠের বাক্সে তিনটে মুক্তো পাওয়া গেল। আর কোথাও মুক্তো পাওয়া গেলো না। বাকি যে দু'তিনটে মুক্তো লা ব্রুশ পেয়েছিল, বোধহয় বিক্রী ক'রে জাহাজ কিনেছে। ফ্রান্সিস স্থির করলো, তাহলে এবার 'মুক্তোর সমুদ্র' থেকে কিছু মুক্তো তুলতে হবে।

কয়েকদিন পরে হ্যারি আর দু'জন ভাইকিংকে সঙ্গে নিয়ে ফ্রান্সিস চললো মুক্তোর সমুদ্রের উদ্দেশ্যে, সঙ্গে নিলো আয়নাটা। এখানে-ওখানে ভাজিম্বাদের পাতা ফাঁদ এড়িয়ে ওরা যখন আগুনে প্রবালের স্তর পেরিয়ে মুক্তোর সমুদ্রের ধারে এলো, তখন বেলা দুপুর। জলে শির্ শির্ ঢেউ উঠছে। চারিদিকে শুধু পাখির ডাক। আর কোনো শব্দ নেই। ফ্রান্সিস একটা কম্বলের ঝুলিমত এনেছিল। সেটা নিয়ে আর আয়নাটা কোমরে

গুঁজে জলে ঝাঁপ দিল। সোজা নীচে নেমে গেল। অসমান তলদেশে আগে কোমর থেকে খুলে আয়নাটা রাখলো। তারপর জলের ওপরে উঠে এলো। ভালো ক'রো দম নিয়ে আবার ডুব দিলো। দেশে মুক্তো শিকারীদের সঙ্গে জলের নীচে ডুব দেওয়া, সাঁতার দেওয়া, এসব ভালোভাবেই অভ্যেস করছিল। এখন সেটা দারুণভাবে কাজে লাগলো।

সেই অপরূপ দৃশ্য জলের তলদেশে। এখানে-ওখানে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য মুক্তো। বড়-বড় ঝিনুকের মুখখোলা পেটেও মুক্তো। ঝিনুকের সংখ্যাও কত। সেই নীলচে-বেগুনী আলোর বন্যা। ফ্রান্সিস দেখলো বেশ কয়েকটা লাফ্ মাছ আয়নাটাতে ঢুঁ দিচ্ছে। রক্ত বেরুছে মাছগুলোর মুখ থেকে। তবু ঢুঁ দেবার বিরাম নেই।

ফ্রান্সিস মুক্তো তুলতে লাগলো। ভরতে লাগলো সঙ্গে আনা কম্বলের ঝোলাটাতে। দম ফুরিয়ে গেলে উপরে উঠে এলো। আবার ডুব দিলো। আবার মুক্তো তুলতে লাগলো। ঝোলাটা ভরে গেলো। অনেক মুক্তো তুলে ফেলাতে জলের তলদেশে আলোর তেজ কমে গেলো। আয়নাটা থেকে যে আলো বিচ্ছুরিত হ'তে লাগলো, তাতে আগের উজ্জ্বলতা আর রইলো না। আর এখানে থাকা বিপজ্জনক। ওর দিকে লাফ্ মাছের নজর পড়তে পারে। ও ওপরে উঠে এলো। সাঁতরে এসে পারে উঠে ঝোলাটা হ্যারির হাতে দিলো।

এত মুক্তো? আর কত বড়-বড়। হ্যারি খুশিতে ঝোলাটা উঁচিয়ে ধরে হাসতে লাগলো। ফ্রান্সিস কিছুক্ষণ জলের ধারে ব'সে দম নিলো, তারপর সকলেই ফিরে চললো।

ফ্রান্সিস ঝোলা ভর্তি মুক্তো এনেছে, দেখে ভাইকিংরা আনন্দে মাতোয়ারা হ'য়ে গেলো। রাত হ'লে চত্বরে আগুন জেবলে তার চারপাশে সবাই ঘুরে-ঘুরে নাচতে লাগলো, আর গলা ছেড়ে গান গাইতে লাগলো। সারারাত আনন্দের আসর চললো। যখন আনন্দের জোয়ার ঝিমিয়ে এলো, তখন ভোর হয়-হয়।

* * *

দিন সাতেক কেটে গেলো। ভাজিম্বা সেনাপতি এখন একেবারে সুস্থ। সে ভাঙা পর্তুগীজ ভাষায় বারবার ফ্রান্সিসকে ধন্যবাদ দিলো। ওদের জন্যেই সে বেঁচে গেছে, এটা সে জীবনেও ভুলবে না, একথাই বারবার বলতে লাগল।

দিন আট-দশ পরে ফ্রান্সিস একদিন সেনাপতিকে বললো, 'চলুন বনে গিয়ে রাজা, মন্ত্রী আর অন্য যারা আছে, তাদের নিয়ে আসি। আমরা এবার দেশে ফিরবো।'

ফ্রান্সিস আর হ্যারি সেনাপতিকে সঙ্গে নিয়ে চললো। ভাঙা-ভাঙা পর্তুগীজ ভাষায় সেনাপতি সেই সব অত্যাচারের কাহিনী বলছিল পথ চলতে-চলতে।

বনের মধ্যে ঢুকলো ওরা। হ্যারি বললো—'আর কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে এলে হ'তো'। ফ্রান্সিস বললো—'আমিও তাই ভেবেছিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আনি নি। কারণ অত লোকজন দেখলে আত্মগোপনকারী ভাজিম্বারা আমাদের ভুল বুঝতো। আমাদের বিপদই বাড়তো তাতে'। হ্যারি ভেবে দেখলো কথাটা ঠিক।

প্রথমে ছাড়া গাছপালা। তারপর বন ঘন হ'তে লাগলো। সূর্যের আলো পর্যন্ত ঢোকে না, এমন নিবিড় সেই বন। সেনাপতি ব'লে যেতে লাগলো, এই বনে-পাহাড়ে কি কষ্টের মধ্যে তাদের দিন কেটেছে। ক্ষুধার জ্বালা সহ্য করতে না না পেরে কত ভাজিম্বা যুবক লা ব্রুশের সঙ্গীদের হাতে ধরা দিয়েছে। লা ব্রুশ ওদের পেট পুরে খেতে দিয়েছে।

তারপর ধ'রে নিয়ে গেছে 'মুক্তোর সমুদ্রে'। জোর ক'রে বর্শার খোঁচা মেরে ওদের মুক্তো আনতে জলে নামিয়ে দিয়েছে। তারপর কেউ বেঁচে ফিরে আসে নি।

ওরা নানা কথা বলতে-বলতে বনজঙ্গল ভেঙে চলেছে। তখনই ফ্রান্সিস লক্ষ্য করলো বাঁদিকে একটা প্যান্ডানাস গাছের ডাল ভীষণ জোরে দুলে উঠলো। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতেই ফ্রান্সিস দেখলো একটা বর্শা বিদ্যুৎ বেগে ছুটে আসছে হ্যারির দিকে। ফ্রান্সিস সঙ্গে-সঙ্গে হ্যারিকে জোরে ধাক্কা দিল। হ্যারি উবু হ'য়ে একটা ঝোপের ওপর পড়ে গেল। কিন্তু শেষ রক্ষা হ'লে না। ফ্রান্সিস দ্রুত স'রে যেতে গেলো, কিন্তু ততক্ষণে বর্শাটা ছুটে এসে ফ্রান্সিসের উরু ছুঁয়ে চ'লে গেলো। এক পলকে ঘটনাটা ঘটে গেল। ফ্রান্সিসের উরু অনেকটা জখম হ'ল। গলগল ক'রে রক্ত ছুটলো। ও আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলো না। মাটিতে শুয়ে পড়লো। হ্যারি পাগলের মত ছুটে এসে ওর উরুটা চেপে ধরলো। কিন্তু রক্ত পড়া বন্ধ হ'লো না। ফ্রান্সিস ব্যথায় গোঙাতে লাগলো। হ্যারি চীৎকার ক'রে সেনাপতিকে বললো 'শীগ্গির ভাজিম্বাদের বলুন, আমরা ওদের শত্রু নই।'

সেনাপতি সঙ্গে-সঙ্গে ভাজিম্বাদের ভাষায় চীৎকার ক'রে একনাগাড়ে কি বললো। বোধহয় লা ব্রুশের পরাজয় সংবাদ দিলে। ফ্রান্সিসরা যে ওদের বন্ধু, এ কথাও বললো।

বনজঙ্গলের গাছ-গাছালির আড়াল থেকে ভাজিম্বা যোদ্ধারা বর্শা হাতে কাছে আসতে লাগলো। কাছে এসে ফ্রান্সিসদের চারপাশে ঘিরে দাঁড়ালো ওরা। রোগার্ত, পাংশুমুখ ওদের। কতদিন না খেয়ে আছে, কে জানে। সেনাপতি ওদের কি বললো। ওদের মধ্যের একজন ছুটে গিয়ে একটা লতাগাছ নিয়ে এলো। ফ্রান্সিসের জখমের দু'পাশে লতা দিয়ে বেঁধে দিলো। রক্তপড়া একটু কমলো। তারপর ঐ ভাজিম্বাটি লতাগাছটার কয়েকটা পাতা মুখে পুরলো। কিছুক্ষণ চিবিয়ে তারপর উরুর ক্ষতের উপর সেই চিবিয়ে থ্যাৎলানো পাতাগুলো লাগিয়ে দিলো। একটু জ্বালা করে উঠলো। আস্তে-আস্তে ঠাণ্ডা লাগলো ক্ষতের জায়গাটা। ফ্রান্সিস একটু আরাম বোধ করলো।

সেনাপতি ওদের কি জিজ্ঞেস করলো। ওরা বাড়িয়ে দূরের পাহাড়টা দেখলো। সেনাপতি ফ্রান্সিস আর হ্যারির দিকে তাকিয়ে পর্তুগীজ ভাষায় বললো-'ঐ পাহাড়ের কোন গুহায় রাজা আছেন। আমি রাজা-মন্ত্রী ওদের আনতে যাচ্ছি। ওদের ব'লে যাচ্ছি এর মধ্যে ওরা গাছের ডালপালা কেটে একটা মাচামতো তৈরী করবে। তাতে আপনাকে শুইয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। আমি রাজা-মন্ত্রী নিয়ে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই সেনাপতি রাজা, মন্ত্রী এবং অন্য সব গণ্যমান্য ভাজিম্বাদের নিয়ে সেখানে এলো। সেনাপতি ফ্রান্সিস আর হ্যারিকে দেখিয়ে রাজাকে কি বললো। রাজা হেসে ফ্রান্সিস আর হ্যারির গায়ে হাত বুলালো। চারজন ভাজিম্বা ফ্রান্সিসের মাচাটা কাঁধে তুলে নিল। সকলে মিলে এবার ফিরে চললো রাজবাড়ির উদ্দেশ্যে। এবার ভাইকিংদের দেশে ফেরার পালা। এর মধ্যে একদিন ফ্রান্সিস হ্যারিকে বললো—'হ্যারি, আমাকে একবার রাজদরবারে নিয়ে চলো'।

—ওখানে যাবে কেন ?

—আমি যে 'মুক্তোর সমুদ্র' থেকে অনেক মুক্তো এর মধ্যেই এনেছি, যে কথাটা রাজাকে বলবো। দেশে মুক্তো নিয়ে যাবার অনুমতি চাইবো।

—মনে তো হয় না ; রাজা এতে আপত্তি করবে ।

—তবু ব'লে-কয়ে নেওয়াটাই ভালো ।

ফ্রান্সিস আর হ্যারি নৌকোয় চড়ে চাঁদের দ্বীপে এলো। রাজদরবারে ওরা যখন পৌঁছলো, তখন দুপুর হ'য়ে গেছে। দেখলো, রাজসভার কাজ চলছে। ওদের দরবার ঘরে ঢুকতে দেখে সেনাপতি এগিয়ে এসে ওদের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের কাছে বসার জায়গা ক'রে দিলো। ফ্রান্সিস সেনাপতিকে বললো, 'রাজাকে আমরা একটা কথা বলতে চাই।'

—কি কথা ?

—আপনি রাজাকে বলুন, যে আমি রাজার অনুমতি না নিয়ে 'মুক্তোর সমুদ্র' থেকে কিছু মুক্তো তুলেছি। এখন এ সব মুক্তো নিয়ে যেতে পারি কিনা।

তখন রাজসভায় একটা বিচার চলছিলো। সেটা শেষ হ'তেই সেনাপতি উঠে দাঁড়িয়ে ফ্রান্সিসের কথাগুলো রাজাকে বললো। রাজা মৃদু হেসে ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে ভাজিম্বা ভাষায় কি সব বলে গেলো। সেনাপতি সেটা পর্তুগীজ ভাষায় বলে দিলো—'রাজা বলছেন, আপনি যে সৎ এবং মহৎ প্রকৃতির মানুষ, এটা আপনার ব্যবহারেই প্রকাশ পেয়েছে। আপনি আমাকে না জানিয়ে অনায়াসে মুক্তোগুলো নিয়ে চলে যেতে পারতেন। আপনি তা করেন নি। এতেই আপনার সততা প্রকাশ পাচ্ছে। আপনি সাহস আর বুদ্ধিবলেই মুক্তো সগ্রহ করেছেন। ঐ মুক্তোগুলো আপনার সাহসিকতার পুরস্কার। তবে চাঁদের দ্বীপে অধিষ্ঠাতা দেবতার নামে শপথ ক'রে বলছি, ঐ মুক্তোগুলো নিয়ে ব্যবসা করবেন না। আমি ঐ ব্যবসা করতে চেয়েছিলাম ব'লেই রাজত্ব হারিয়েছিলাম। চাঁদের দ্বীপের অধিষ্ঠাতা দেবতার অভিশাপ লেগেছিলো। আমার অনুরোধ, আপনি তা করবেন না। যে সব মুক্তো আপনি সংগ্রহ করেছেন, সে সবই আপনার।'

ফ্রান্সিস মাথা নুইয়ে বারবার রাজাকে ধন্যবাদ দিলো। তারপর জাহাজে ফিরে এলো।

ফ্রান্সিস আর হ্যারি জাহাজে ফিরতেই সবাই ছুটে এলো। ফ্রান্সিস ওদের দিকে তাকিয়ে ব'লে উঠলো 'জাহাজ ছাড়ো, এবার দেশে ফেরা যাক্।'

সকলেই একসঙ্গে চীৎকার ক'রে উঠলো 'ও-হো-হো-।'

ঘর্ ঘর্ শব্দে নোঙর তুলে নতুন জাহাজটা দ্রুত বেগে ঢেউ ভেঙে ছুটলো।

বিকেল হ'য়ে এসেছে। ফ্রান্সিস আর হ্যারি জাহাজের রেলিঙে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পশ্চিম আকাশে নেমে আসা সূর্যের শেষ আলোয় ওখানে যেন রঙের বন্যা চলেছে। সেইদিকে আনমনে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে ফ্রান্সিস কোমরের ফেট্টিতে গোঁজা কি যেন বের করলো। হ্যারি দেখলো। হ্যারি দেখলো, বেশ বড় আকারের মুক্তো একটা। হেসে বললো—"কি ব্যাপার ? এই মুক্তোটা এখনও যে হাতছাড়া করছো না ?"

ফ্রান্সিস হেসে বললো—'এটা সবচেয়ে বড়। এটা রাজকুমারীকে উপহার দেবো।'

'—তাই বলো।' হ্যারি হাসলো। ও আর কোন কথা বললো না। লাল আলোময় দূর দিগন্তের দিকে তাকিয়ে ফ্রান্সিস তখন কি কথা ভাবছিলো, তা ফ্রান্সিসই জানে।

———

এই গ্রন্থের পূর্ববর্তী অধ্যায়—**সোনার ঘণ্টা** ১০., **হীরের পাহাড়** ৮.
এই গ্রন্থের পরবর্তী অধ্যায়—**তুষারে গুপ্তধন** ১০., **রূপোর নদী** ১০